সাহিত্যপাঠ
তৃতীয় ভাগ
শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VIII Vide Notification No. 76/8/TB/19, dated 27. 1. 76.

সাহিত্য পাঠ

[তৃতীয় ভাগ]

(অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য)

বিশু মুখোপাধ্যায়

[শিশু সাহিত্য 'মৌচাক পুরস্কার' ও 'সুধীরচন্দ্র সরকার পুরস্কার' প্রাপ্ত]

অনুবাদক, ওল্ড কিউরিয়োসিটি শপ, টয়লার্স অব দি সী,

অ্যাড্‌ভেঞ্চারস্ অব মার্কো পোলো ইত্যাদি

এবং সম্পাদক, 'পুরাতন প্রসঙ্গ'

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

(প্রতিষ্ঠিত : ১৯৪০

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড : : কলকাতা—৭০০০০৭

সূচীপত্র

॥ পদ্যাংশ ॥

॥ গদ্যাংশ ॥

পদ্যাংশ

কৈকেয়ীর ব্যথা

কৃত্তিবাস ওঝা

দেশেতে আইল রাম আনন্দ সবার।
শুনিল কৈকেয়ী রানী শুভ সমাচার॥
অভিমানে কৈকেয়ীর বারিপূর্ণ আঁখি।
কথা কি ক'বেন রাম 'মা' বলিয়া ডাকি॥
যদি রাম পূর্বমত করে সম্ভাষণ।
রাখিব এ দেহ, নহে ত্যজিব জীবন॥
এতেক ভাবিয়া রানী হৈল অধোমুখ।
করেতে রাখিল এক বিষের লড্ডুক॥
যদি রাম মা বলিয়া না ডাকে আমারে।
ত্যজিব এ পাপ প্রাণ বিষপান ক'রে॥
এত বলি অভিমানে রহিলেন রানী।
অন্তরে জানিল তাহা রাম রঘুমণি॥
হইল ব্যথিত প্রাণ বিমাতার তরে।
আগেতে চলিল রাম কৈকেয়ীর ঘরে॥
ধূলায় বসিয়া রানী বিরস বদন।
হেনকালে রাম গিয়া বন্দিল চরণ॥
অরণ্যে পড়িয়াছিনু অনেক প্রমাদে।
উদ্ধার হয়েছি সবে তব আশীর্বাদে॥
লজ্জায় কৈকেয়ী কহিছেন রঘুনাথে।
কোন্ দোষে দোষী আমি তোমার অগ্রেতে॥

বনে গেলে দেবতার কার্যসিদ্ধি লাগি।
আমাকে করিলে কেন নিমিত্তের ভাগী ॥
অরি মারি দেবতার বাঞ্ছা পুরাইলি।
আমার মাথায় দিয়ে কলঙ্কের ডালি ॥
এতেক দুর্গতি কৈলে জানিয়া বিমাতা।
লজ্জিত হইয়া রাম হেঁট কৈল মাথা ॥
কৈকেয়ীরে তোষে রাম বিনয় বচনে।
তব দোষ নাই—ভুঞ্জি দৈববিড়ম্বনে ॥
তোমা হইতে পালাম সুগ্রীব সুমিত।
সঙ্কটেতে সুগ্রীব করিল বড় হিত ॥
তোমার প্রসাদে করি সাগরবন্ধন।
রাবণে মারিয়া তুষিলাম দেবগণ ॥
জানিলাম লক্ষ্মণের যতেক ভকতি।
জানিলাম সীতাদেবী পতিব্রতা সতী ॥
তোমা হইতে ধর্মাধর্ম জানিলাম মাতা।
রামবাক্যে কৈকেয়ী দ্বিগুণ পাইল ব্যথা ॥

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। রাম ফিরে এসেছেন শুনে কৈকেয়ীর মনে কী ভাবের উদয় হয়েছিল?

২। রাম কৈকেয়ীর চরণ বন্দনা করবার পর কৈকেয়ী তাঁকে কী বলেছিলেন? রাম তার উত্তরে কৈকেয়ীকে কী কী বলেছিলেন?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

৩। "অরি মারি দেবতার……কলঙ্কের ডালি।"—প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কথাগুলির অর্থ বুঝিয়ে লেখ।

৪। "জানিলাম লক্ষ্মণের……পাইল ব্যথা।"—আলোচ্য অংশটি কার লেখা, কোন্ কবিতার অন্তর্গত? উক্তিটি কার? কাকে তিনি কথাগুলি বলেছিলেন? লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি ও সীতার পতিভক্তির যৎসামান্য উল্লেখ কর।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৫। রামচন্দ্রের নির্বাসনদণ্ডের জন্য কৈকেয়ীকে তুমি কতখানি দায়ী বলে মনে কর।

৬। রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, সীতা এবং কৈকেয়ীর মধ্যে কাকে তোমার সব চাইতে ভাল লাগে? কেন?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

৭। বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :—বিষ, আনন্দ, দোষী, হিত, বন্ধন।

৮। লিঙ্গান্তর কর :—রানী, মা, পতি, দেব।

৯। পদান্তর কর :—বিনয়, দৈব, ভক্তি, পতিব্রতা, ব্যথা।

১০। 'অরি' শব্দের তিনটি প্রতিশব্দ লেখ।

———

শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্যোগ

ভারতচন্দ্র রায়

ভবানীর কটূভাষে লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে
ক্ষুধানলে কলেবর দহে।
বেলা হৈল অতিরিক্ত পিত্তে হৈল গলা তিক্ত
বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে॥
হেঁট মুখে পঞ্চানন নন্দীরে ডাকিয়া কন
বৃষ আন যাইব ভিক্ষায়।
আন শিঙ্গা হাড়মাল ডমরু বাঘের ছাল
বিভূতি লেপিয়া দেহ গায়॥
আন রে ত্রিশূল ঝুলি প্রমথ সকলগুলি
যতগুলি ধুতুরার ফল।
থলিভরা সিদ্ধিগুঁড়া লহরে ঘোট্ না কুঁড়া
জটায় আছয়ে গঙ্গাজল॥
ঘর উজাড়িয়া যাব ভিক্ষায় হে পাই খাব
অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস।
নারী যার সতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা
তাহারে উচিত বনবাস॥
বৃদ্ধকাল আপনার নাহি জানি রোজগার
চাষবাস বাণিজ্য ব্যাপার।
সকলে নির্গুণ কয় ভুলায়ে সর্বস্ব লয়
নামমাত্র রহিয়াছে সার॥

যত আনি তত নাই না ঘুচিল খাই খাই
কী বা সুখ এ ঘরে থাকিয়া।
এত বলি দিগম্বর আরোহিয়া বৃষবর
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া॥

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। শিব ভিক্ষায় বের হবার জন্য কিরূপ আয়োজন করলেন ?

২। এই কবিতায় কবি ভারতচন্দ্র রায় তৎকালীন দরিদ্র সমাজের এক সুন্দর আলেখ্য রচনা করেছেন—তুমি কবিতাটি পাঠ করে ঐ আলেখ্য নিজ ভাষায় অঙ্কন কর।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

৩। "আন শিঙ্গা হাড়মাল……দেহ গায়॥"—আলোচ্য অংশটি কার লিখিত কোন্ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে ? একথাগুলি কে কাকে কোন্ প্রসঙ্গে বলেছেন ? 'শিঙ্গা', 'হাড়মাল', 'বিভূতি'—শব্দগুলির অর্থ বুঝিয়ে লেখ।

৪। "নারী যার……উচিত বনবাস॥"—উক্তিটি কার ? কেন তিনি একথা বলেছিলেন। তাঁর নারী কে ? 'জীয়ন্তে মরা' বলতে কি বোঝ ? 'সতন্তরা' শব্দের অর্থ কি ?

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৫। "ভবানীর কটুভাষে লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে
ক্ষুধানলে কলেবর দহে।"

—'ভবানী' কে ? তাঁর অপর নাম কি ? 'কৃত্তিবাস'-এর অপর নাম কী কী ? কেন তাঁকে কৃত্তিবাস নামে ডাকা হয় ?

৬। 'আন রে ত্রিশূল ঝুলি প্রমথ সকলগুলি
যতগুলি ধুতুরার ফল।'

—'প্রমথ' কে ? এত ফল থাকতে তিনি ধুতুরার ফল আনতে বলেছেন কেন ? ত্রিশূল ও ঝুলি ছাড়া কী কী শিবের সঙ্গে থাকতে দেখেছ ?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

৭। সাধু ভাষায় রূপান্তর কর :
হৈল, সহে, কন, আছয়ে, ছাড়িনু, কয়।

৮। ব্যাসবাক্য সহ সমাস লেখ :
কৃত্তিবাস ক্ষুধানলে, পঞ্চানন, অন্নাব, ধি, সতন্তরা, নিগুর্ণ, দিগম্বর।

বিজয়া-দশমী

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে !
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে !—
উদিলে নিদয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে !
বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি ! কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এমন জুড়াবে ?
তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার ; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে !
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি !"—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী ।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। কবিতাটির সারমর্ম লেখ।

২। মাইকেল খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও মনে প্রাণে পরিপূর্ণভাবে বাঙালী ছিলেন। —বিজয়া-দশমী কবিতাটি পাঠ করে এ সত্যের যথার্থতা বিচার কর।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

৩। "বার মাস তিতি……মন জুড়াবে?"—কবিতাংশটি কোন্ কবিতার অংশ? এই কবিতাটির রচয়িতার নাম কী? এই উক্তিটি কবি কার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন? 'তারা-কুন্তলে' শব্দটির প্রয়োগ-সার্থকতা কর।

৪। "দ্বিগুণ আঁধার……গিরীশের রাণী।" —উদ্ধৃতাংশটি কার লেখা কোন্ কবিতার অন্তর্গত। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কথাগুলির অর্থ বুঝিয়ে লেখ।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৫। "যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে॥" —উক্তিটি কে কার উদ্দেশ্যে করেছেন? এখানে কোন্ রজনীর কথা বলা হয়েছে? সেই রজনীকে না যাবার জন্যে তাঁর আবেদন জানানোর কারণ কী?

৬। 'গিরীশের রাণী'—গিরীশ কে? তাঁর রাণীই বা কে? 'গিরীশ' কথাটির তিনটি সমার্থক শব্দ লেখ।

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

৭। ব্যাসবাক্য-সহ সমাস লেখ:
তারা-কুন্তলে, বিরহ-জ্বালা, স্বর্ণদীপ, কর্ণ-কুহরে।

৮। পদান্তর কর:—
উদয়, মন, মাস, দিন, দীর্ঘ, নিশা।

৯। দয়াময়ি, সতি, রজনি—এই শব্দগুলির শেষে হ্রস্ব-ই ব্যবহার করা হয়েছে কেন?

———

ওই গো আগুন লেগেছে হোথায়—লক্‌-লক্‌ শিখা উঠিছে কেঁপে।
দাউ দপদপ ধুধু ধরে যায়—দেখিতে দেখিতে পড়িল ব্যেপে!
'জল জল জল' ঘোর কোলাহল, ফট্‌ ফট্‌ ফট্‌ ফাটিছে বাঁশ,
ধুঁয়ায় তথায় ভরিল সকল, লাল হয়ে গেল নীল আকাশ।
ছুটিছে বাতাস হলক হলক, ঝলসিছে সব লাগিছে যাতে,
তবুও এখন চারিদিকে লোক, তামাসা দেখিতে উঠিছে ছাতে।
'কারো সর্বনাশ কারো পোষ মাস' পরের বিপদে কেহ না নড়ে,
আপনার ঘরে পশিলে হুতাস, মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়ে।
কোথা এ-বাড়ির ছেলেমেয়ে যত, ঘরের ভিতর কেহ যে নাই;
আগুন দেখিতে উহাদের মত, উপরে উঠিছে বুঝি সবাই।
কেন গেল ছাদে, এ কি সর্বনাশ! কে আছে আগুলে ওদের কাছে?
অনল মাখিয়ে বহিছে বাতাস, ছাদে এ-সময় দাঁড়াতে আছে?
যাই যাই আমি ওখানে এখন, যেথা কুঁড়েগুলি জ্বলিয়া যায়,
দেখি চেয়ে করি প্রাণপণ, বাঁচাবার যদি থাকে উপায়।
এই যে দাঁড়িয়ে করুণাসুন্দরী, উপর চাতালে থামের কাছে
মুখখানি হায় চুনপানা করি', অনলের পানে চাহিয়া আছে,
চুলগুলি সব উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়িছে ঢাকিয়া মুখকমল;
কচি কচি দুটি কপোল বহিয়া গড়িয়ে আসিছে নয়ন-জল।
যেন মৃগশিশু সজল নয়নে দাঁড়ায়ে গিরির শিখর পরি,
ত্রাসে দাবানল দেখে দূর বনে স্বজাতি জীবের বিপদ স্মরি'!

হে সুরবালিকে, শুভ-দরশনে, সুবর্ণ প্রতিমে কেন গো কেন
সরল উজল কমল-নয়নে আজি অশ্রুবারি বহিছে হেন !
দুঃখীদের দুখে হয়েছ দুঃখী, উদাস হইয়ে দাঁড়ায়ে তাই,
শুকায়েছে মুখ, আহা শশিমুখী, লইয়ে বালাই মরিয়ে যাই !

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। কবি আগুন লাগার যে ভয়াবহ রূপ বর্ণনা করেছেন, তা গল্পচ্ছলে নিজের ভাষায় লেখ।

২। কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করে, এর 'করুণাসুন্দরী' ব্যতীত অন্য কোন নাম দেওয়া কি সম্ভব ছিল? তুমি এর অন্য দু' একটি নাম উল্লেখ করতে পার কিনা দেখ।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

৩। "ছুটিছে বাতাস হলক হলক, ঝলসিছে সব লাগিছে যাতে,"—পঙ্‌ক্তিটি কবির কোন কবিতার অন্তর্গত? বাতাস "হলক হলক" ছুটিতেছে অর্থে কি বোঝা যায়?

৪। "যেন মৃগশিশু সজল নয়নে দাঁড়ায়ে গিরির শিখর 'পরি"—পঙ্‌ক্তিতে কার সঙ্গে কবি মৃগশিশুর তুলনা করেছেন?

৫। "কারো সর্বনাশ কারো পোষ মাস,"—বাক্যটির যথার্থ অর্থ বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা কর।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৬। "দুঃখীদের দুখে হয়েছে দুঃখী"—কে এবং কেন?

৭। "ত্রাসে দাবানল দেখে দূর বনে স্বজাতি জীবের বিপদ স্মরি।"—কবি এক্ষেত্রে "স্বজাতি জীবের" শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহার করেছেন?

৮। "দাবানল" শব্দের অর্থ বিস্তারিত ভাবে লেখ।

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

৯। কবিতায় ব্যবহৃত "শশিমুখী" ও "মুখকমল"-এর ন্যায় মুখের গুণবাচক অন্য কোন শব্দ যদি ব্যবহার করা যায় লেখ।

১০। "কোলাহল" শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ লেখ।

১১। "ব্যেপে", "হুতাশ", "কপোল", "তামাসা"—প্রভৃতি শব্দগুলি দিয়ে একটি করে বাক্য রচনা কর।

১২। "অনল মাখিয়া বহিছে বাতাস"—পঙ্‌ক্তিটির মধ্যে "অনল"—ও "বাতাস"-এর তিনটি করে প্রতিশব্দ বার কর।

———

(সারনাথে মূলগন্ধকুটি বিহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রচিত)

ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশ-দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আরবার এদেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো তুমি।
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হ'ক, মুক্ত হ'ক মোহ-আবরণ,
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।
চিত্ত যেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হ'ক প্রাণবান।
খুলে যাক্ রুদ্ধদ্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি
ভারত-অঙ্গন-তলে আজি তব নব আগমনী,
অমেয় প্রেমের বার্তা শতকণ্ঠে উঠুক নিস্বনি—
এনে দিক অজেয় আহ্বান।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। সারনাথে বৌদ্ধমন্দির মূলগন্ধকুটিবিহার প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে রচিত "ওই নামে একদিন ধন্য হ'ল দেশান্তরে তব জন্মভূমি।" পঙ্‌ক্তিটিতে বিশ্বকবি "ওই নামে" বলতে কোন্ নামের কথা উল্লেখ করেছেন ?

২। কবিতাটির ভাবার্থ তোমার নিজের ভাষায় সহজভাবে ব্যক্ত কর।

৩। বুদ্ধদেবের জন্মস্থান ভারতে, না অন্য কোথায় কোন্ স্থানে ?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

৪। 'বোধিদ্রুম' কি এবং কোথায় ব্যাখ্যা কর।

৫। "বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ", কবি কেন বলেছেন ?

৬। "মুক্ত হোক মোহ আবরণ"—পঙ্‌ক্তিটির মধ্যে কবি "মোহ আবরণ" মুক্ত হওয়ার কথা বলেছেন কেন ?

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৭। "তোমার বোধনমন্ত্র"—'বোধনমন্ত্র' কি ? এবং কি অর্থে বোধনমন্ত্রের কথা উল্লিখিত হয়েছে ?

৮। "হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু"—'হেথাকার' বলতে কোথাকার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ? এবং 'তন্দ্রালস বায়ু'ই বা বলেছেন কেন ?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

৯। "অমেয়", "অজেয়", "নিস্বনি" প্রভৃতি শব্দগুলির সহজ অর্থ লেখ ;

১০। "অমিতাভ", "অমিতায়ু", "আরবার" প্রভৃতি শব্দগুলির সাহায্যে একটি করে বাক্য রচনা কর।

———

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহি রে !
ওগো, আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে ।

বাদলের ধারা ঝরে ঝর্ ঝর্,
আউশের ক্ষেত জলে ভর-ভর,
কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার
ঘনায়েছে, দেখ চাহি রে !
ওগো, আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে ॥

ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘনঘন,
ধবলীরে আনো গোহালে ।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে ।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে, ওগো দেখ্ দেখি—
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরেছে কি ?

রাখাল বালক কী জানি কোথায়
সারাদিন আজ খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে॥

শোনো শোনো—ওই পারে যাবে ব'লে
কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে।
পূবে-হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দু'কূল বহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদর বেগে জলে পড়ি জল
ছলছল উঠে বাজি রে,
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে॥
ওগো, আজ তোরা যাস্‌নে গো তোরা
যাস্‌নে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর
নাহি রে।
ঝর্ ঝর্ ধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ঐ বেণুবন দুলে ঘনঘন—
পথপাশে দেখ্ চাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে॥

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। কবি 'আষাঢ়' কবিতায় যে চিত্রটি এঁকেছেন তা তোমার নিজের ভাষায় একটি অনুচ্ছেদ লেখ।

২। কবিতাটি 'বর্ষামঙ্গল উৎসব' অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করে শোনাও।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

৩। 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে

তিল ঠাঁই আর নাহিরে!'

—কবিতাটি কার রচিত কোন্ কবিতার অন্তর্গত? কবি 'নবঘনে' বলতে কী বুঝিয়েছেন? 'তিল ঠাঁই নেই' কেন? 'ঘন' কথাটির কয় রকম অর্থ করতে পার লেখ।

৪। "শোনো শোনো……আজি রে!"—কবিতাংশটি কে কোন্ প্রসঙ্গে বলেছেন? এই কথাগুলির অর্থ বুঝিয়ে লেখ।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৫। 'ঝর্ ঝর্ ধারে ভিজিবে নিচোল'—নিচোল কথাটির প্রতিশব্দ লেখ। 'ধারে' আর কি হয়েছে?

৬। 'দু'কূল বহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ—দু'কূল ও দুকূল কথা দুটির পার্থক্য নির্ণয় কর। কোন্ সময় ঢেউ এরূপ হল এবং কী কারণে?

৭। "ওই ডাকে শোন ধেনু ঘন ঘন,

ধবলীরে আনো গোহালে।"

—'ধেনু' শব্দটির অর্থ আর কী কী হতে পারে লেখ। ধবলীর সঙ্গে গোহালের সম্পর্ক যেমন মানুষের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক তেমন?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

৮। নিম্নরেখাঙ্কিত শব্দের পরিবর্তন করিয়া বাক্যগুলি পুনরায় লেখ:

(ক) খেয়া-পারাপার-বন্ধ হয়েছে। (বিপরীত শব্দ দ্বারা)

(খ) কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার। (প্রতিশব্দ দ্বারা)

(গ) তিল ঠাঁই আর নাহিরে! (গদ্যরূপ দ্বারা)

(ঘ) 'ঐ বেণুবন দুলে ঘনঘন—' (সমার্থক শব্দ দ্বারা)

(ঙ) 'এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু পোহালে॥" (গদ্যরূপ দ্বারা)

———

ওরা ভেবেছিল মনে, আপনার নাম
মনোহর হর্ম্যরূপ বিশাল অক্ষরে,
ইষ্টক-প্রস্তরে রচি চিরদিন তরে
রেখে যাবে। মূঢ় ওরা, ব্যর্থ-মনস্কাম।
প্রস্তর খসিছে ভূমে প্রস্তরের' পরে,
চারিদিকে ভগ্নস্তূপ তাহাদের তলে
লুপ্ত স্মৃতি ; শুষ্ক তৃণ কাল-নদী-জলে
ভেসে যায় নামগুলি, কেবা রক্ষা করে !
মানব-হৃদয়-ভূমি করি অধিকার
করেছে প্রতিষ্ঠা যারা দৃঢ় সিংহাসন ;
দরিদ্র আছিল তারা, ছিল না সম্বল
প্রস্তরের এত বোঝা জড়ো করবার :
তাদের রাজত্ব হের অক্ষুণ্ণ কেমন,
কালস্রোতে ধৌত নাম নিত্য সমুজ্জ্বল।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। যারা নিজেদের কীর্তিকে অক্ষয় করবার জন্যে সৌধ গড়ে আর যারা গড়ে না—এদের মধ্যে কার স্মৃতি বেশীদিন স্থায়ী হয় ও কেন ?

২। কবিতাটি পড়ে কী বুঝলে অল্প কথায় গুছিয়ে লেখ।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

৩। "শুষ্ক তৃণ কাল-নদী-জলে
ভেসে যায় নামগুলি, কেবা রক্ষা করে !"

—আলোচ্য অংশটি কার লেখা কোন্ কবিতা থেকে উদ্ধৃত ? কবি এখানে কাদের নাম কাল-নদী-জলে ভেসে যাবার কথা বলেছেন ? 'কাল-নদী-জল'-এর অর্থ লেখ।

৪। "তাদের রাজত্ব হের···নিত্য সমুজ্জ্বল।"

—কার লেখা কোন্ কবিতায় এই পঙ্‌ক্তি দুটি কোন্ অংশে স্থান পেয়েছে ? কাদের রাজত্ব অক্ষুণ্ণ এবং কেমনে তাদের নাম নিত্য সমুজ্জ্বল হয়েছে লেখ।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৫। কাদের কীর্তি ইট বা পাথরে গড়া না হলেও অমর হয়ে থাকে ? ইট-পাথরে গড়া কীর্তিকে কি ধরে রাখা যায় ?

৬। স্মৃতিতে বেঁচে থাকার জন্য কী প্রয়োজন ?—সৌধ গড়া, না মানুষের জন্যে ভালো কাজ করা ?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

৭। মনোহর, মনস্কাম, সিংহাসন—শব্দ তিনটির সন্ধিবিচ্ছেদ কর।

৮। শুদ্ধরূপ লেখ : মনোহর, হর্ম, মনস্কাম, ভগ্নস্তূপ, অক্ষুণ্ণ, সমুজ্জ্বল।

৯। ব্যর্থ-মনস্কাম, ভগ্নস্তূপ, লুপ্ত-স্মৃতি, নিত্যসমুজ্জ্বল—কথাগুলি অর্থসহ বাক্যে প্রয়োগ কর।

———

নাই সে সরল কিশোর বয়স, সাঙ্গ সুখের খেলা
আম্রবনে সখার সাথে প্রাণের কথা বলা।
পথের বাঁকে গাছের ফাঁকে   শালিক শ্যামা দোয়েল ডাকে,
শালুক-ফোটা বিলের বুকে ভাসে কলার ভেলা।

উড়িয়ে ময়ূরপঙ্খি ঘুড়ি চিলের ছাতে উঠে,
জয়োল্লাসে অট্টহাসি দেশের ছেলে জুটে'—
কোথায় রে সেই খেলার সাথী,   ঝাউবাগানে চড়ুইভাতি?
নির্ভাবনায় মূর্তিগুলি ফুলের মত ফুটে।

বুড়ো শিবের মন্দিরে সেই বটের ঝুরি ধরি'
মনের সাধে দুলত এসে হাবুল, ভোলা, হরি।
রথের দিনে মিতের সনে   সুখের তুফান জাগ্‌ত মনে,
চোখে চোখে চল্‌ত কথা নাগরদোলায় চড়ি'।

নাম ধরে সেই ডাক্‌ত যারা নিত্য সকাল সাঁঝ,
যায় না তাদের চিনতে পারা দেখ্‌তে পেলেও আজ,
নেই সেদিনের চিহ্নটিও,   পর হয়েছে পরাণ-প্রিয়
উদাস চোখে থম্‌কে তাকায় হয়ত পথের মাঝ।

আজকে কেবল আসছে মনে সেই দিনকার কথা,
চিত্তে যখন জাগ্‌ত না রে মিথ্যা কুটিলতা।
ফিরবে কি সেই সুখের দিবা ? ফুটবে হাসি অরুণ বিভা ?
তপোবনের বালক-সম শান্ত প্রসন্নতা ?

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। কবিতাটির মর্মকথা কি ?

২। কোন্ বয়সের কথা কবিতাটিতে কবি বলতে চাইছেন, নিজের ভাষায় গদ্যে লেখ।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

৩। "চোখে চোখে চল্‌ত কথা নাগরদোলায় চড়ি।"—পঙ্‌ক্তিটি কোন্ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে এবং কার লেখা ?

৪। "চোখে চোখে চল্‌ত কথা",—বলতে কবি কি বলতে চেয়েছেন, নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা কর।

৫। "নেই সেদিনের চিহ্নটিও",—বলতে কোন্ দিনের কথা বলা হয়েছে ?

৬। "চিত্তে যখন জাগ্‌ত না রে মিথ্যা কুটিলতা।—কোন্ বয়সে, কখন মনে মিথ্যা কুটিলতা জাগ্‌ত না ?

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৭। "সুখের তুফান জাগ্‌ত মনে", পঙ্‌ক্তির মধ্যে "সুখের তুফান" কথাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর।

৮। "তপোবনের বালক-সম" বলতে কি বোঝ ?

৯। "ফুটবে হাসির অরুণ বিভা"—পঙ্‌ক্তিটিতে কবি হাসির সঙ্গে 'অরুণ বিভা'র তুলনা করেছেন কেন বুঝিয়ে লেখ

১০। "ময়ূরপঙ্খি" কি ? "মিতা" কাকে বলে ? "পরাণ-প্রিয়" অর্থে কি বোঝায় ?

———

আমি শুনেছি সে কোন্ দেশে অজানা মাঠের শেষে,
অচেনা নদীটি মেশে সাগর-জলে ;
সেথা অনামা গিরির ছায়া কাননের কিনারায়
বাস করে নিরালায় জেলের দলে।
তারা মাছ বেচে হাটে হাটে খেয়া দেয় ঘাটে ঘাটে
খেলা করে খোলা মাঠে গাঙের চরে ;
সুখে হাসিয়া কাটায় কাল নাই বড়ো গোলমাল
ভাবনার জঞ্জাল ভয় না করে।
তারা মিলেমিশে থাকে সুখে কথা কয় চোখে-মুখে ;
রাগ হ'লে তাল ঠুকে লড়ায়ে মাতে ;
তবু কোনদিন কারো কাছে বিচার কভু না যাচে,
নিজের বিচার আছে নিজেরি হাতে।
তারা সভ্যতা শিক্ষার নাহি জানে ধিক্কার,
ভিক্ষার নাহি ধার ধারে কোনদিন,
শুধু চাষ করে জাল বোনে, খায়দায় আনমনে,
সাগরের গান শোনে স্বভাব-স্বাধীন।

সেথা ভীমু নামে ভারি জেলে মোড়ল সে বহুকেলে'—
তাহারি লায়েক ছেলে মেঘরাজ নাম ;
ভারি জোয়ান পাথর-কাটা কস্‌কসে কালো গা-টা,
নিটোল বুকের পাটা সুডোল সুঠাম।
ঝাড়া দীঘল সে সাত হাত নাই কোন দৃক্‌পাত।
ডিঙা ঠেলে দিনরাত গাঙের জলে।
বড়ো 'মক্ষুম' মার তার লক্ষ্যের কী বাহার ;
টেঁটা'য় হানে শিকার গহন-তলে।
সে যে শক্তির ভাণ্ডারী সাহসের গাণ্ডার-ই,
তুফানের কাণ্ডারী জোড়া নাই তার।
ভারি সাঁতারের সর্দার পাথারে 'খবরদার',
নৌকা-ই ঘর-দ্বার এমনি ব্যাপার !
কত রাত-ভিত ঝড়-জল, কিছুতে না চঞ্চল
ডিঙিখানা টলমল চ'লেছে বেয়ে,
বড়ো একগুঁয়ে একরোখ ভয় করে সব লোক,
বুড়ো যুবা যেই হোক ছেলে কি মেয়ে।

অনুশীলনী

১। কবি এই কবিতায় কাদের কেন স্বভাব-স্বাধীন বলেছেন ? কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

২। কবি এই কবিতায় গ্রাম্য জেলেদের একটি সুন্দর আলেখ্য রচনা করেছেন। তুমি নিজের ভাষায় ঐ আলেখ্যটি অঙ্কন কর।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

৩। "বড়ো 'মক্ষম' মার তার……গহন তলে।"

—এই কথাগুলি কার লেখা কোন্ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে? কবি এখানে কার 'মক্ষম' মার-এর কথা বলেছেন? তার লক্ষ্যের ব্যবহারের প্রশংসা কেন করা হয়েছে? 'টেঁটা'য় কিভাবে শিকার করা হয় লেখ।

৪। "আমি শুনেছি সে কোন্ দেশে…সাগরজলে";

—এই অংশটি কোন্ কবিতার অন্তর্গত? কবি মাঠকে অজানা ও নদীকে অচেনা বলেছেন কেন? সেই অজানা-অচেনা নদীর উপরের কাণ্ডকারখানা তিনি কিভাবে বর্ণনা করেছেন?

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৫। 'তাহারি লায়েক ছেলে মেঘরাজ নাম'—কার লায়েক ছেলে? 'লায়েক ছেলে' বলতে কী বোঝ? তার চেহারার বর্ণনা দাও।

৬। "শক্তির ভাণ্ডারী সাহসের গাণ্ডার-ই"-কে? তার শক্তি ও সাহসের পরিচয় দাও।

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

৭। 'নদীটি মেশে সাগর জলে'—নদী ও সাগরের কত রকম নাম জান লেখ।

৮। তুফান, পাথার, জোয়ান, মোড়ল—এই কথাগুলির প্রকৃত অর্থ লেখ এবং কথাগুলি দিয়ে যথার্থ বাক্য রচনা কর।

———

বীরসিংহের সিংহশিশু বিদ্যাসাগর বীর।
উদ্বেলিত দয়ার সাগর বীর্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয় !
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।
নিঃস্ব হয়ে বিশ্বে এলে দয়ার অবতার !
কোথাও তবু নোয়াওনি শির জীবনে একবার।
দয়ায় স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,
সৌম মূর্তি তেজের স্ফূর্তি চিত্ত চমৎকার।
নামলে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্বাদ,
করলে পূরণ অনাথ আতুর অকিঞ্চনের সাধ ;
অভাজনে অন্ন দিয়ে—বিদ্যা দিয়ে আর—
অদৃষ্টেরে ব্যর্থ তুমি করলে বারংবার।
মানুষ খুঁজি তোমার মতো—একটি তেমন লোক
স্মরণ-চিহ্ন মূর্ত্ত, যে জন ভুলিয়ে দেবে শোক।
অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগর ! মৃত্যু-বিজয় নাম,
ঐ নামে হায় লাভ করেছে অনেক ব্যর্থকাম,
তোমার লাগি অশ্রু আজও ঝরে নিরন্তর,
কীর্তিঘন মূর্তি তোমার জাগে প্রাণের' পর।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। আলোচ্য কবিতা পাঠ করে বিদ্যাসাগর চরিত্রের যে ভাবমূর্তি তোমার মনে ফুটে ওঠে তার ভাষাচিত্র অঙ্কন কর।

২। 'সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়!'—কথাটির তাৎপর্য কি বিশ্লেষণ কর।

৩। কবিতাটি বিদ্যাসাগরের জন্মদিন পালনে স্মরণ কর।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

৪। "দয়ায় স্নেহে······চিত্ত চমৎকার।"

—কার লেখা কোন্ কবিতা থেকে অংশটি উৎকলিত? কার সম্বন্ধে একথা বলা হয়েছে? তাঁর দয়া ও স্নেহ সম্বন্ধে কোন ঘটনা জানা থাকলে তার একটির উল্লেখ কর। কবি একবার বলেছেন ক্ষুদ্র দেহ, আবার তিনি বলেছেন সৌম মূর্তি —এদুটি প্রয়োগের তাৎপর্য কি?

৫। "অভাজনে অন্ন দিয়ে······করলে বারংবার।"—কথাগুলি কোন্ কবিতায় আছে? কার সম্বন্ধে কবি একথাগুলি বলেছেন? তাঁর অন্নদান ও বিদ্যাদান সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৬। 'বীরসিংহের সিংহশিশু'—কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে? কেন এরূপ বলা হয়েছে?

৭। 'অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়'—অবিশ্বাসী কারা? কাকে দেখে, কেন, কী বিশ্বাস তাদের মনে দৃঢ় হয়েছে?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

৮। অর্থ লেখ ও বাক্যে ব্যবহার কর:

উদ্বেলিত, সুগম্ভীর, প্রত্যয়, নিঃস্ব, পারাবার, অকিঞ্চন।

৯। পদ নির্ণয় কর: বীর, বীর্য, দয়া, নিঃস্ব, সৌম, তেজ।

১০। সমনাম শব্দ লেখ: সাগর, অগ্নি, দেহ।

———

দাতার প্রধান জাফর নিত্য দান করে দুঃখীজনে,
তাহার তুল্য নাহি বদান্য বিশ্বাস মনে মনে।
একদা সহসা উদ্যানমাঝে সান্ধ্যভ্রমণকালে,
হেরে তার দাস ক্ষুধায় কাতর বসে আছে আলবালে।
দিবসশেষের তিনখানি রুটি প্রাপ্য আহার তার
একে একে দিল কুকুরের মুখে,—বিচিত্র ব্যবহার।
কহিল জাফর, "ওরে বিষ্কা, সারাদিন উপবাসী।
দিবসশেষের খাদ্য তাহাও কুকুরেরে দিলি হাসি ?"
চমকি বান্দা জোড়হাতে কয়—"মানুষ হয়েছি ভবে,
আজিকে ভাগ্যে না হয় আহার, কাল পুনরায় হবে।
খোদার এ জীবে আহার কে দিবে ? ক্ষুধায় বাঁচাবে কেবা ?
মোরা যে ধরাতে এসেছি করিতে নিখিল জীবের সেবা।"
কহিল জাফর আঁখি ছলছল—'আবিসিনিয়ার দাস'
আজিকে দর্প করিলি চূর্ণ ছিঁড়ে দিলি মোহ-পাশ।
গুরুর মন্ত্র কানে দিলি তুই, দে রে কোল, বুকে আয় ;
দুর্দিনে ধীর, সেরা দানবীর তুই দীন দুনিয়ায়।

রাজকোষ যেবা মুক্ত করেছে দাতা নাহি কই তারে,
সেই ত্যাগ-বীর বুকের রুধির হেলায় যে দিতে পারে।
রে চির বান্দা, নহিস বন্দী,—দিলাম মুক্তি প্রাণ,
এই বাগানের মালিক হইয়া প্রাণ ভ'রে কর দান।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। 'দাতা' কবিতাটির কাহিনী নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

২। কবিতাটির প্রথম আট ছত্র অবিকল মুখস্থ লেখ।

৩। "মোরা যে ধরাতে এসেছি করিতে নিখিল জীবের সেবা।"—এই বাক্যটি কার লেখা কোন্ কবিতার অন্তর্গত। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কে কাকে একথা বলেছিল লেখ। 'জীবের সেবা' বলতে কী বোঝ?

৪। "রাজকোষ যেবা……দিতে পারে।"

—আলোচ্য কবিতাংশটি কার লেখা কোন্ কবিতার অন্তর্গত? উক্তিটি কে কার প্রতি কথন করেছিল? প্রকৃত দাতা ও প্রকৃত ত্যাগী পুরুষ কে? 'বুকের রুধির'—কিভাবে দান করা যায়?

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৫। "আবিসিনিয়ার দাস"—কে? তাকে আবিসিনিয়ার দাস বলা হয়েছে কেন?

৬। 'রে চির বান্দা, নহিস বন্দী'—কে চির বান্দা? তাকে চির বান্দা বলা হয়েছে কেন? 'বান্দা' কথাটির অন্য অর্থ দাও। বান্দা ও বন্দীতে পার্থক্য কী?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

৭। নীচের বাক্যটির যে যে শব্দের বিপরীত অর্থ হয় সেগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লেখ: দাতার প্রধান জাফর নিত্য দান করে দুঃখীজনে।

৮। শব্দার্থ লেখ ও বাক্যে ব্যবহার কর: বদান্য, আলবালে, বিচিত্র, মোহ-পাশ, রুধির।

———

দেখিনু সেদিন রেলে
কুলি ব'লে এক বাবুসা'ব তারে ঠেলে দিলে নীচে ফেলে।
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি ক'রে কি জগৎ জুড়িয়া মার খায় দুর্বল ?
যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,
বাবুসা'ব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে।
বেতন দিয়েছ ? চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল !
কত পাই দিয়ে কুলিদের দান ? কত ক্রোর পেলি বল্ ?
রাজ-পথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প শকট, দেয় ছেয়ে গেল কলে।
বল ত এসব কাহাদের দান ? তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা ? ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইটে আছে লিখা।
তুমি জান নাক, কিন্তু পথের প্রতি ধুলিকণা জানে,
ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট, অট্টালিকার মানে।

আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ—
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা গাহি তাহাদের গান,
তাদেরই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!
তুমি শুয়ে রবে তেতলার 'পরে আমরা রহিব নীচে,
অথচ তোমারে আমরা দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে!
সিক্ত যাদের সারা দেহ-মন মাটির মমতা-রসে।
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরই বশে।
তারি পদরজ অঞ্জলি করি' মাথায় লইব তুলি'
সকলের সাথে পথে চলি যার পায়ে লাগিয়াছে ধুলি।
আজি নিখিলের বেদনা-আর্ত পীড়িতের মাখি খুন,
লালে লাল হয়ে উঠেছে নবীন প্রভাতের নবারুণ।
আজ হৃদয়ের জঙ-ধরা যত কবাট ভাঙিয়া দাও,
রঙ করা ঐ চামড়ার যত আবরণ খুলে নাও।
আকাশের আজ যত বায়ু আছে হইয়া জমাট নীল,
মাতামাতি ক'রে ঢুকুক এ বুকে খুলে দাও যত খিল।
সকল আকাশ ভাঙিয়া পড়ুক আমাদের এই ঘরে,
মোদের মাথায় চন্দ্র সূর্য তারারা পড়ুক ঝ'রে।
সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি,
এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শুন এক মিলনের বাঁশী।

একজনে দিলে ব্যথা—
সমান হইয়া বাজে সে বেদনা সকলের বুকে হেথা।
একের অসম্মান।
নিখিল মানব-জাতির লজ্জা—সকলের অপমান।
মহা-মানবের মহা-বেদনার আজি মহা-উত্থান,
উর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান॥

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। কুলি-মজুর বাবুসাহেবদের কাছে কিরূপ ব্যবহার পেয়ে থাকে তা কবিতা অবলম্বনে লেখ।

২। 'সমাজে কুলি-মজুরের দান' সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ রচনা কর।

৩। কবি কুলি-মজুরকে কোন্ চোখে দেখেছেন এবং কিভাবে তাদের প্রতি সমাজকে আচরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন লেখ।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

৪। "তারাই মানুষ……নব উত্থান!"

—কোন্ কবির লিখিত কোন্ কবিতা থেকে এই পংক্তি দুটি উদ্ধৃত হয়েছে? কবি কাদের মানুষ বলেছেন? 'নব উত্থান' বলতে তিনি কী-ই বা বুঝিয়েছেন?

৫। "একের অসম্মান
নিখিল মানব-জাতির লজ্জা—সকলের অপমান।"

—উক্তিটি কার? কোন্ কবিতায় তিনি একথা বলেছেন? কথাগুলির যথার্থ অর্থ সুবিন্যস্ত করে লেখ।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৬। "দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা"—দেনা কী ?

৭। "তারাই মানুষ"—কারা ? কবি কাদের কথা এখানে ইঙ্গিত করেছেন ?

৮। "এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শুন এক মিলনের বাঁশী"—এই বাঁশীর সুরে কী ধ্বনিত হচ্ছে ?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

৯। বিপরীতার্থক শব্দ লেখ : দুর্বল, মিথ্যাবাদী, শুভদিন, পবিত্র, উত্থান, নবীন, আবরণ, অসম্মান, অপমান।

১০। প্রতিশব্দ লেখ : সূর্য, চন্দ্র, ধরণী, পাহাড়।

১১। নীচে উদ্ধৃত অংশটির প্রতিটি পদের পরিচয় দাও :

"আজি নিখিলের……নবারুণ।"

———

নাহি কাজ তার, নাহি অবসর, বাড়ি বাড়ি ফেরে ঘুরি',
সারা গ্রামখানি খুঁজে দেখ তার মিলিবে না আর জুড়ি।
কতক গোয়ালে কতক বা মাঠে, ফেরে গরু তার যত,
বেড়াহারা গাছ ছাগলে যে খায় দেখিতে পারে না অত।
জন-মজুরেরা লাঙল চালায় আধা দিন দেয় ফাঁকি,
মাঠে যেতে বলো নোটনকে, আর পাবে নাকো দেশে ডাকি'।
নূতনহাটে সে সাতবার যায়, নিত্য পরের লাগি',
পরের বিপদে ঘুম নাই চোখে কাটায় যামিনী জাগি'।
কোথায় ছেলেরা মেতেছে খেলায়, করিছে চড়ুইভাতি,
সকাল হইতে নোটন সেখানে হয়েছে তাদের সাথী।
গ্রামের ভিতর যাত্রা আসিলে যাবে না ফিরিয়া কভু,
ঘরে নাই ভাত, বাড়ি বাড়ি চাঁদা নোটন তুলিবে তবু।
জুয়াচোরে যদি কেঁদে ধার চায়, ধার ক'রে দেবে এনে,
ছাগল বেচিয়া শুধিয়াছে ধার, শেখে না ঠেকিয়া জেনে।
ভায়েরা এখন চিনেছে তাহাকে দেয় না পয়সা হাতে,
লক্ষ্মীছাড়ার কোন খেদ নাই, কোন দুখ নাই তাতে।
নাইক অভাব, তেম্নি স্বভাব, না থাকুক কড়ি কাছে,
গিয়াছে কমলা, হৃদয়-কমল তেমনি ফুটিয়া আছে।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। নোটনের বিচিত্র চরিত্রের বিষয় গল্পচ্ছলে নিজের ভাষায় লেখ।

২। তার চরিত্রের মধ্যে বিশেষ যে গুণটি তোমাকে আকৃষ্ট করে সেইটি লেখ।

৩। 'নোটন'-এর ন্যায় চরিত্র গুণের না দোষের সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা কর। গুণের হলে কেন গুণের এবং দোষের হলে কি জন্য দোষের মূলতঃ সেইটুকুই বলা চাই।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

৪। "নাইকো অভাব, তেম্নি স্বভাব, না থাকুক কড়ি কাছে,
গিয়াছে কমলা, হৃদয়-কমল তেমনি ফুটিয়া আছে।"

উপরে উল্লিখিত কবিতাটির শেষ দুটি চরণ বিষদভাবে ব্যাখ্যা কর।

৫। "জুয়াচোরে যদি কেঁদে ধার চায়, ধার করে দেবে এনে",—এটা কি ঠিক? যদি ঠিক না হয়, কেন নয় সংক্ষেপে লেখ।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৬। "ভায়েরা, এখন চিনেছে তাহাকে দেয় না পয়সা হাতে",—কি চিনেছে এবং কেনই বা পয়সা হাতে দেয় না? এই চেনাই কি তাদের ঠিক চেনা।

৭। "ঘরে নাই ভাত, বাড়ি বাড়ি চাঁদা নোটন তুলিবে তবু।"—এটা কি ঠিক?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

৮। বিপরীত শব্দ লেখ: অবসর, বেড়াহারা, যামিনী, অভাব।

———

রানার ছুটেছে তাই ঝুম্ ঝুম্ ঘন্টা বাজছে রাতে
রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে,
রানার চলেছে রানার !
রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার—
কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার।

রানার ! রানার !
জানা-অজানার
বোঝা আজ তার, কাঁধে,
বোঝাই জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে ;
রানার চলেছে, বুঝি ভোর হয় হয়,
আরো জোরে, আরো জোরে—এ রানার দুর্বার দুর্জয়।
তার জীবনের স্বপ্নের মতো পিছে সরে যায় বন,
আরো পথ, আরো পথ—বুঝি হয় লাল ও-পূর্বকোণ।
অবাক রাতের তারারা আকাশে মিট্‌মিট্ ক'রে চায় ;
কেমন ক'রে এ রানার সবেগে হরিণের মতো যায় !

কত গ্রাম, কত পথ যায় স'রে স'রে—
শহরে রানার যাবেই পৌঁছে ভোরে ;
হাতে লণ্ঠন করে ঠন্‌ঠন্ জোনাকিরা দেয় আলো,
মাভৈঃ ! রানার এখনো রাতের কালো ।

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। 'রানার' কবিতাটি পাঠ করে শ্রমিক-সমাজের প্রতি কবির মনোভাব প্রকাশ কর।

২। 'রানার' কবিতা অবলম্বনে রানার-জীবনের একটি ভাষাচিত্র অঙ্কন কর।

৩। "আরো পথ আরো পথ—বুঝি হয় লাল ও পূর্বকোণ।"
—আলোচ্য পঙ্‌ক্তিটি কার লেখা কোন্ কবিতা থেকে উৎকলিত হয়েছে ? কবি কোন্ কথা বলতে গিয়ে একথা বলেছেন ? 'বুঝি হয় লাল ও পূর্বকোণ'—পূর্বকোণ লাল হওয়ায় ভয় কিসের ?

৪। "মাভৈঃ ! রানার এখনো রাতের কালো !"
—এই পঙ্‌ক্তিটি কোন্ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে ? রাতের কালো থাকলে রাণারের ভয় নেই কেন বুঝিয়ে বল।

• সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৫। 'রানার ছুটছে'—তাই কি বাজছে ? তার হাতে কি ?

৬। 'বোঝাই জাহাজ'—এখানে কোন্ জাহাজের কথা বলা হয়েছে ? সে জাহাজে কি আছে ?

৭। 'অবাক রাতের তারারা আকাশে'—তারাদের অবাক হবার কি আছে ?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

৮। পদ নির্ণয় কর :
ঝুম্‌ঝুম্, দুর্বার, মিট্‌মিট্, সবেগে, লণ্ঠন, ঠনঠন, মাভৈঃ।

৯। বিপরীত শব্দ লেখ :
রাতে, নতুন, অজানা, জোরে, দুর্জয়, কালো।

———

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৫। 'আমাদের বাড়ী চোর এসেছিল'—কবে? তখন চোরের গা কেমন ছিল? চোর কী জিনিস চুরি করতে এসেছিল? অপরের জিনিস নেবার তার ইচ্ছা ছিল না কেন?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

৬। নীচে লেখা বিশেষণ পদগুলি ঠিক ঠিক শব্দের পূর্বে বসাও যেন অর্থ টি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হয়ঃ

বিশেষণ : কনকনে, বেচারা, রোগা, ভীষণ, ভাঙা।

শব্দ : ছেলেটা, জ্বর, শীত, জানালা, চোর।

৭। শূন্যস্থানে কবিতার কথা বসাওঃ

(ক) আকাশ ——। (খ) —— দোর খুলে। (গ) তাকালো — ভাবে। (ঘ) —জানি হাত পাতা। (ঙ) মাপ করো ——।

———

গদ্যাংশ
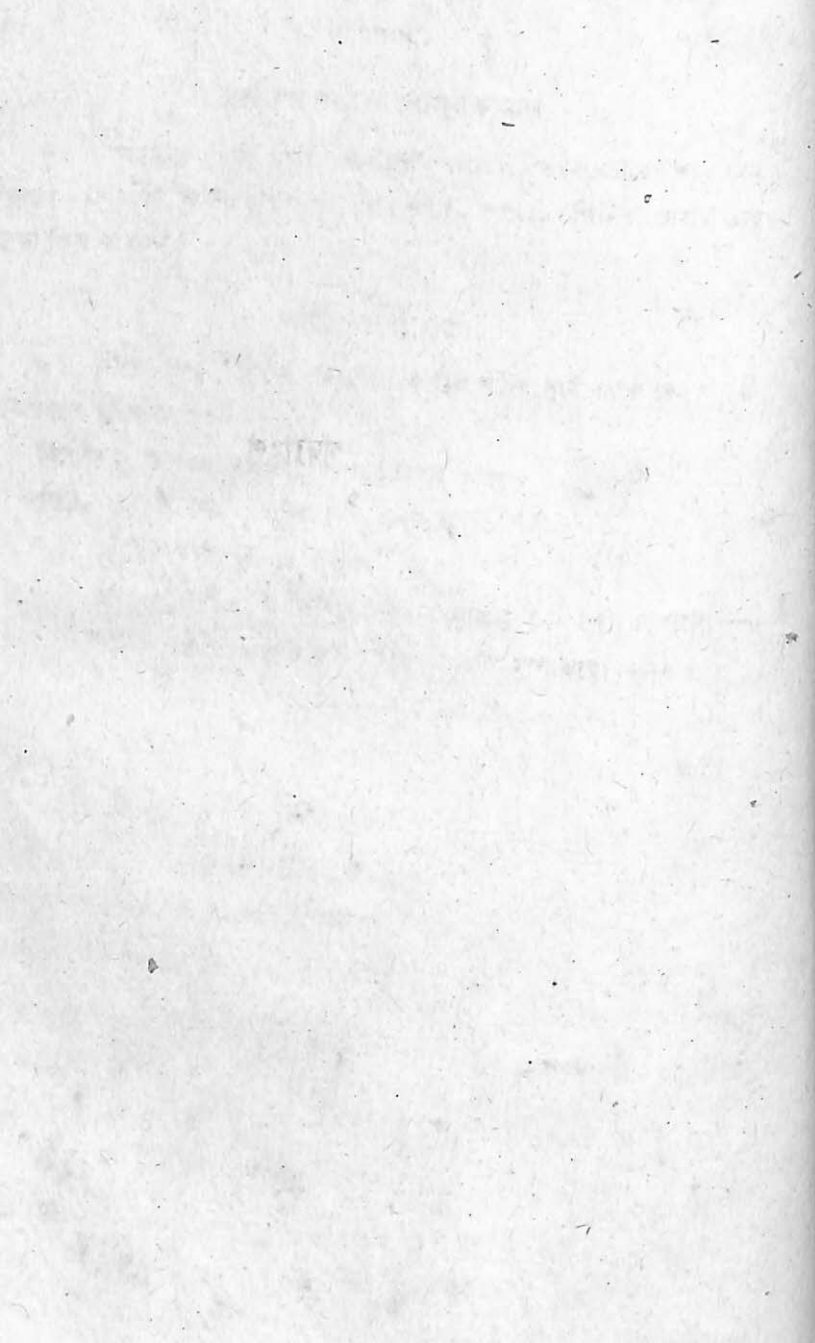
১২৩৫ সালের কার্তিক মাসের শেষভাগে, আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম। বড়বাজার নিবাসী ভাগবতচরণ সিংহ পিতৃদেবকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তদবধি তিনি তদীয় আবাসেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। যে সময় আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম, তাহার অনেক পূর্বে সিংহ-মহাশয়ের দেহত্যাগ ঘটিয়াছিল। এক্ষণে তদীয় একমাত্র পুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহ সংসারের কর্তা। এই সময় জগদ্দুর্লভবাবুর বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসর। গৃহিণী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তাঁহার স্বামী ও দুই পুত্র, এক বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনী ও তাঁহার একমাত্র পুত্র, এইমাত্র তাঁহার পরিবার। জগদ্দুর্লভবাবু পিতৃদেবকে পিতৃব্যশব্দে সম্ভাষণ করিতেন। সুতরাং আমি তাঁহার ও তাঁহার ভগিনীদিগের ভ্রাতৃস্থানীয় হইলাম। তাঁহাকে দাদামহাশয়, তাঁহার ভগিনীদিগের বড়দিদি ও ছোটদিদি বলিয়া সম্ভাষণ করিতাম।

এই পরিবারের মধ্যে অবস্থিত হইয়া পরের বাটীতে আছি বলিয়া একদিনের জন্যও আমার মনে হইত না। সকলেই যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিন্তু কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন, আমি কস্মিনকালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নভাব ছিল না। ফলকথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবমূর্তির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কথা উপস্থিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্তন করিতে করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধহয় সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে। যে রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই। আমি পিতামহী দেবীর একান্ত প্রিয় ও নিতান্ত অনুগত ছিলাম। কলিকাতায় আসিয়া প্রথমতঃ কিছুদিন তাঁহার জন্য, যারপর নাই, উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। সময়ে সময়ে তাঁহাকে মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিতাম। কিন্তু দয়াময়ী রাইমণির স্নেহ ও যত্নে, আমার সেই বিষম উৎকণ্ঠা ও উৎকট অসুখের অনেক অংশে নিবারণ হইয়াছিল।

এই সময়ে, পিতৃদেব মাসিক দশটাকা বেতনে জোড়াসাঁকো নিবাসী রামসুন্দর মল্লিকের নিকট নিযুক্ত ছিলেন। বড়বাজারের চকে মল্লিক

এক দোকান ছিল। ঐ দোকানে লোহা ও পিতলের নানাবিধ বিলাতী জিনিস বিক্রীত হইত। যে সকল খরিদ্দার ধারে জিনিস কিনিতেন, তাহাদের নিকট হইতে পিতৃদেবকে টাকা আদায় করিয়া আনিতে হইত। প্রতিদিন প্রাতে এক প্রহরের সময় কর্মস্থানে যাইতেন; রাত্রি এক প্রহরের সময় বাসায় আসিতেন। এ অবস্থায় অন্যত্র বাসা হইলে আমার মত পল্লীগ্রামের অষ্টম-বর্ষীয় বালকের পক্ষে কলিকাতায় থাকা কোনমতেই চলিতে পারিত না।

জগদ্দুর্লভবাবুর বাটীর অতি সন্নিকটে, শিবচরণ মল্লিক নামে এক সম্পন্ন সুবর্ণবণিক ছিলেন। তাঁহার বাটিতে একটি পাঠশালা ছিল। ঐ পাঠশালায় তাঁহার পুত্র, ভাগিনেয়, জগদ্দুর্লভবাবুর ভাগিনেয়রা ও আর তিন-চারিটি বালক শিক্ষা করিতেন। কলিকাতায় উপস্থিতির পাঁচ-সাত দিন পরেই আমি ঐ পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এই তিন মাস তথায় শিক্ষা করিলাম। পাঠশালার শিক্ষক স্বরূপচন্দ্র দাস, বীরসিংহের শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় অপেক্ষা শিক্ষাদান বিষয়ে অধিকতর নিপুণ ছিলেন।

ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভে রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হইলাম। কলিকাতায় থাকিলে আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা নাই, এই স্থির সংবাদ পাইবামাত্র পিতামহী দেবী অস্থির হইয়া, কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন, এবং দুই-তিন দিন অবস্থিতি করিয়া, আমায় লইয়া বাটী প্রস্থান করিলেন। বাটীতে উপস্থিত হইয়া, বিনা চিকিৎসায়, সাত-আট দিনেই আমি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইলাম।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রথম কলিকাতায় আসিয়া কাহাদের বাড়িতে উঠিয়াছিলেন? ঐ বাড়ীর বাসিন্দাদের সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্যগুলি লিখ।

২। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্ত্রীজাতীর প্রতি পক্ষপাতী হইবার কারণগুলি প্রবন্ধ অনুসরণে লিখ।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

৩। 'আমি স্ত্রীজাতীর পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন।'—উদ্ধৃতাংশটি কাহার লিখিত ও কোন্ প্রবন্ধের অন্তর্গত? কোন প্রসঙ্গে লেখক একথা বলিয়াছেন? এই 'নির্দেশ অসঙ্গত' নহে, লেখক ইহার কী কী যুক্তি দেখাইয়াছেন?

৪। "কিন্তু দয়াময়ী……নিবারণ হইয়াছিল।"—কোন বিষম উৎকণ্ঠার কথা লেখক এখানে নির্দেশ করিয়াছেন? তাঁহার প্রতি রাইমণির স্নেহ ও যত্ন ব্যাখ্যা কর।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৫। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কখন প্রথম কলিকাতায় আসেন?

৬। তাঁহার পিতৃদেবকে কে আশ্রয় দিয়াছিলেন?

৭। রাইমণির কোন কোন গুণ লেখক জীবনেও ভুলিতে পারিবেন না বলিয়াছেন?

৮। রাইমণির অন্যান্য গুণগুলি নিজের ভাষায় লিখ।

৯। কলিকাতায় উপস্থিতির পাঁচ-সাতদিন পরে ঈশ্বরচন্দ্র কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছিলেন? কতদিন তিনি ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন? কে ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন?

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১০। পাঠের কথাগুলি শূন্যস্থানে বসাও:

(ক) জগদ্দুর্লভ পিতৃদেবকে — সম্ভাষণ করিতেন। সুতরাং আমি তাঁহার ও তাঁহার ভগিনীদিগের — হইলাম। তাঁহাকে ——, তাঁহার ভগিনীদিগকে — ও — বলিয়া সম্ভাষণ করিতাম।

(খ) এই দয়াময়ীর —, আমার হৃদয়মন্দিরে, — ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে।

(গ) আমি পিতামহী দেবীর একান্ত — ও নিতান্ত — ছিলাম।

(ঘ) পাঠশালার শিক্ষক —, বীরসিংহের শিক্ষক — — অপেক্ষা শিক্ষাদান বিষয়ে, অধিকতর — ছিলেন।

১১। পদান্তর করিয়া নিম্নলিখিত শব্দগুলি নির্দিষ্ট ঘরে লিখ :

অবস্থিতি, অমায়িকতা, উৎকণ্ঠিত, নিবারণ, উপস্থিতি, নিপুণ, পক্ষপাতী, অনুগত, নিবারণ।

বিশেষ্য	বিশেষণ

১২। নিম্নের উদ্ধৃতাংশের নিম্নরেখ শব্দগুলির পরিবর্তে সমার্থক শব্দ বসাইয়া চলতি ভাষায় লিখ :

(ক) কিন্তু <u>কনিষ্ঠা ভগিনী</u> রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন, আমি <u>কস্মিনকালেও বিস্মৃত হইতে</u> পারিব না। তাঁহার এক পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় <u>সমবয়স্ক</u> ছিলেন। পুত্রের উপর <u>জননীর</u> যেরূপ স্নেহ থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন <u>তদপেক্ষা অধিকতর</u> ছিল, তাহার <u>সংশয়</u> নাই।

(খ) কলিকাতায় থাকিলে <u>আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা</u> নাই, এই স্থির করিয়া পিতৃদেব বাটীতে <u>সংবাদ</u> পাঠাইলেন। সংবাদ পাইবামাত্র <u>পিতামহী দেবী</u> অস্থির হইয়া, কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন, এবং দুই-তিন দিন <u>অবস্থিতি করিয়া</u>, আমায় লইয়া বাটি প্রস্থান করিলেন।

লিখিব কি, লিখিবার অনেক শত্রু। আমি এখন যে কুঁড়েঘরে বাস করি, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার পাশে গোটা দুই-তিন ফুলগাছ পুঁতিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, কমলাকান্তের কেহ নাই, এই ফুলগুলি আমার সখা-সখী হইবে। খোসামোদ করিয়া ইহাদের ফুটাইতে হইবে না, টাকা ছড়াইতে হইবে না, গহনা দিতে হইবে না, মন-যোগানো গোছ কথা বলিতে হইবে না, আপনার সুখে উহারা আপনি ফুটিবে।

তা, ফুল ফুটিল—তা'রা হাসিল। মনে করিলাম, মহাশয় গো! কিছু মনে করিতে না করিতে ফুটন্ত ফুল দেখিয়া ভোমরার দল—লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে ভোমরা, বোলতা, মৌমাছি বহুবিধ রসাপেক্ষী রসিকের দল আসিয়া আমার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন গুন্‌গুন্, ভন্‌ভন্, ঝন্‌ঝন্, ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করিয়া হাড় জ্বালাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া বলিলাম, "হে মহাশয়গণ! এ সভা নহে, সমাজ নহে, এসোসিয়েশ্যান—লীগ—সোসাইটী—ক্লাব প্রভৃতি কিছুই নহে—কমলাকান্তের পর্ণকুটীর মাত্র, আপনাদিগের ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে হয়, অন্যত্র গমন করুন।" গুন্‌গুনের

দল তাহাতে কোন মতে সম্মত নহে—বরং ফুলগাছ ছাড়িয়া আমার কুটীরের ভিতর হল্লা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছিলাম—এমত সময়ে এক ভ্রমর—কুচকুচে কালো—আসল বৃন্দাবনী কাঁলাচাঁদ ভোঁ করিয়া ঘরের ভিতর উড়িয়া আসিয়া কানের কাছে ঘ্যান্ ঘ্যান্ আরম্ভ করিলেন—লিখিব কি, মহাশয় ?

ভ্রমর বাবাজী নিশ্চিত মনে করেন, তিনি বড় সুরসিক—বড় সদ্বক্তা—তাঁহার ঘ্যান্ঘ্যানানিতে আমার সর্বাঙ্গ জুড়াইয়া যাইবে। আমারই ফুলগাছের ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া আসিয়া আমারই কানের কাছে ঘ্যান্ঘ্যান্ ? আমার রাগ অসহ্য হইয়া উঠিল, আমি তালবৃন্ত হস্তে ভ্রমরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন আমি ঘূর্ণন, বিঘূর্ণন, সংঘূর্ণন প্রভৃতি বহুবিধ বক্রগতিতে তাল-বৃন্তাস্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিলাম। ভ্রমরও ডীন, উড্ডীন, প্রডীন, সমাডীন প্রভৃতি বহুবিধ কৌশল দেখাইতে লাগিল। তখন দংশনভয়ে অস্থির হইয়া রণে ভঙ্গ দিলাম। ভ্রমর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। সেই সময়ে চৌকাঠ পায়ে বাধিয়া কমলাকান্ত—পপাত ধরণীতলে।

তখন ধূল্যবলুণ্ঠিত শরীরের দ্বিরেফরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, “হে দ্বিরেফসত্তম! কোন অপরাধ-হেতু দুঃখী ব্রাহ্মণ তোমার নিকট অপরাধী যে, তুমি তাহার লেখাপড়ায় ব্যাঘাত করিতে আসিয়াছ ?”

ভ্রমর ঝুপ করিয়া আসিয়া সামনে বসিল। তখন গুন্গুন্ করিয়া গলা দুরস্ত করিয়া বলিতে লাগিল—আমি সকলেরই কথা বুঝিতে পারি—আমি স্থিরচিত্তে শুনিতে লাগিলাম।

ভৃঙ্গরাজ বলিতে লাগিলেন, “হে বিপ্র! আমার উপর এত চোট্ কেন ? আমি কি একাই ঘ্যানঘ্যানে ? তোমার এই বঙ্গভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া ঘ্যান্-ঘ্যান্ করিব না ত কি করিব ? বাঙালী হইয়া

কে ঘ্যান্ঘ্যানানি ছাড়া? কোন্ বাঙালীর ঘ্যান্ঘ্যানানি ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে? তোমাদের মধ্যে যিনি রাজা মহারাজা কি এমনি একটা কিছু মাথায় পাগড়ি ও হইলেন, তিনি গিয়া বেলবিডিয়রে ঘ্যান্ঘ্যান্ আরম্ভ করিলেন। যিনি উমেদারির ইচ্ছা রাখেন, তিনি গিয়া রাত্রি-দিবা রাজদ্বারে ঘ্যান্ঘ্যান্ করেন। যিনি কেবল একটি চাকুরীর উমেদার, তাঁর ঘ্যান্ঘ্যানানির ত আর অন্ত নাই। বাঙালীবাবু যিনি দুই-চারিটা ইংরাজি বোল শিখিয়াছেন, তিনি অমনি উমেদার-রূপে দরখাস্ত বা টিকিট হাতে দ্বারে দ্বারে ঘ্যান্ঘ্যান্—ডাঁশমাছির মত খাবার সময়ে, শোবার সময়ে, বসবার সময়ে, দাঁড়াইবার সময়ে, দিনে রাত্রে, প্রাহ্ণে, অপরাহ্ণে, মধ্যাহ্ণে, সায়াহ্ণে ঘ্যান্-ঘ্যান্-ঘ্যান্। যিনি উমেদারি ছাড়িয়া স্বাধীন হইয়া উকীল হইলেন, তিনি আবার সনদী ঘ্যান্ঘ্যানে। সত্য-মিথ্যার সাগরসঙ্গমে প্রাতঃস্নান করিয়া উঠিয়া যেখানে দেখেন, কাঠগড়ার ভিতরে বিড়ে মাথায় সরকারী জুজু বসিয়া আছে—সেইখানে গিয়া সেই পেশাদার ঘ্যান্ঘ্যানে ঘ্যান্ঘ্যানানির ফোয়ারা খুলিয়া দেন। কেহ বা মনে করেন, ঘ্যান্ঘ্যানানির চোটে দেশোদ্ধার করিবেন—সভাতলে ছেলে-বুড়ো জমা করিয়া ঘ্যান্ঘ্যান্ করিতে থাকেন। কোন্ দেশে বৃষ্টি হয় নাই—এসো বাপু ঘ্যান্ঘ্যান্ করি; বড় চাকরি পাই না—এসো বাপু ঘ্যান্ঘ্যান্ করি। রামকান্তের মা মরিয়াছে—এসো বাপু, স্মরনার্থ ঘ্যান্ঘ্যান্ করি। কাহারও বা তাতেও মন উঠে না, তাঁরা কাগজ কলম লইয়া, হপ্তায় হপ্তায়, মাসে মাসে, দিন দিন ঘ্যান্ঘ্যান্ করেন। আমার চোঁ, বোঁই কি এত কটু?

"তোমায় সত্য বলিতেছি, কমলাকান্ত, তোমাদের জাতির ঘ্যান্ঘ্যানানি আর ভাল লাগে না। দেখ, আমি যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ, আমিও শুধু ঘ্যান্ঘ্যান্ করি না—মধু সংগ্রহ করি, আর হুল ফুটাই। তোমরা না জান মধু সংগ্রহ করিতে, না জান হুল ফুটাইতে, কেবল ঘ্যান্ঘ্যান্

করিতে পার। একটা কাজের সঙ্গে খোঁজ নাই, কেবল কাঁদুনে মেয়ের মত দিবারাত্রি ঘ্যান্‌ঘ্যান্। একটু বকাবকি, লেখালেখি কম করিয়া কিছু কাজে মন দাও—তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। মধু সংগ্রহ করিতে শেখ—হুল ফুটাইতে শেখ। তোমাদের রসনা অপেক্ষা আমাদের হুল শ্রেষ্ঠ—বাক্যবাণে মানুষ মরে না; আমাদের হুলের ভয়ে জীবলোক সদা শঙ্কিত। স্বর্গে ইন্দ্রের বজ্র, মর্ত্যে ইংরেজের কামান, আকাশমার্গে আমাদের হুল। সে যাক্, জিবে কাষ্টকি দিয়া ঘা কর—অগত্যা কাজে মন যাইতে পারে। আর শুধু ঘ্যান্‌ঘ্যান্ ভাল লাগে না।"

এই বলিয়া ভ্রমররাজ ভোঁ করিয়া উড়িয়া গেল।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। কমলাকান্ত কেন কুঁড়েঘরের পার্শ্বে ফুলগাছ পুঁতিয়াছিলেন? ঐ গাছ পুঁতিবার ফলে তিনি কাহাদের দ্বারা কিভাবে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন?

২। ভ্রমরের মুখ দিয়া কমলাকান্ত বাঙালীদের চরিত্রের যে দোষগুলি দেখাইয়াছেন তাহা নিজ ভাষায় লিপিবদ্ধ কর।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

৩। "সেই সময়ে চৌকাঠ পায়ে বাঁধিয়া কমলাকান্ত—পপাত ধরণীতলে।" —এই অংশটি কাহার লেখা কোন্ প্রবন্ধের অন্তর্গত? 'সেই সময়ে' বলিতে কোন্ সময়ের কথা বলা হইয়াছে? কমলাকান্ত কে? 'পপাত ধরণীতলে' বলিতে কি বুঝ?

৪। "কোন্ বাঙালীর ঘ্যান্‌ঘ্যানানি ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে?"—উদ্ধৃতাংশটি কাহার লিখিত কোন্ প্রবন্ধ হইতে উৎকলিত হইয়াছে লিখ। বাঙালীরা কিভাবে ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করে তাহা লেখকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া নিজ ভাষায় লিপিবদ্ধ কর।

৫। "স্বর্গে ইন্দ্রের বজ্র, মর্ত্যে ইংরেজের কামান, আকাশমার্গে আমাদের হুল"—কে কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলিয়াছে? প্রতিটি কথার অর্থ বুঝাইয়া লিখ।

৬। "মধু সংগ্রহ করিতে শেখ—হুল ফুটাইতে শেখ"—এখানে এই কথাগুলি কে কাহাকে কোন্ উদ্দেশ্যে বলিয়াছে? 'মধু' বলিতে কি বুঝিলে? এই হুলের প্রকৃত অর্থ কি?

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৭। "মাথায় পাগড়ি ঙ হইলেন"—পাগড়ি ঙ কী?

৮। 'বেলবিডিয়রে' বলিতে কোন্ স্থানকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে?

৯। তালবৃন্ত হস্তে কমলাকান্ত কত রকম কায়দায় ভ্রমরের সহিত লড়াই করিয়াছিলেন?

১০। ভ্রমর কমলাকান্তের তালবৃন্ত অস্ত্রের সহিত লড়াইয়ে কিভাবে আত্মরক্ষা করিয়াছিল?

১১। 'এ সভা নহে'—আর কী কী নহে তাহা লেখকের বক্তব্য অনুসারে লিখ।

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১২। নিম্নে কতকগুলি শব্দ ও তাহার প্রতিশব্দ একসঙ্গে দেওয়া হইল। শব্দগুলিকে ঠিকমত সাজাইয়া লিখ:

(উদাহরণ: দুর্ভাগ্য—সৌভাগ্য)

দুর্ভাগ্য, হাসিল, প্রাসাদ, সৌভাগ্য, পর্ণকুটির, স্থির, কাঁদিল, অস্থির, আদি, অসম্মত, অন্ত, সম্মত।

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

১৩। সন্ধিবদ্ধ কর:

দেশ + উদ্ধার = ; রস + অপেক্ষা = ; মন + মত = ; অপর + অহ্ন = ।

১৪। সমার্থক শব্দগুলি বাছিয়া লিখ:

ভ্রমর—মধুকর, বাবাজী, দ্বিরেফরাজ, মৌমাছি, ভৃঙ্গরাজ।

রাত্রি—নিশা, সৌদামিনী, যামিনী, সজনী, রজনী, কমলিনী।

আকাশ—মেঘ, গগন, লগন, অম্বর, সম্বর, ব্যোম, সভা, নভঃ।

———

রেশম

ইউরোপীয়েরা চীনদেশ হইতে রেশমের পোকা আনিয়াছিলেন এবং অনেক শত বৎসর চেষ্টা করিয়া তাঁহারা রেশমের কারবার খুলিতে পারিয়াছেন। তাহাদের সংস্কার চীনই, রেশমের জন্মস্থান ; চীনেরাও তাহাই বলে।

কিন্তু আমরা চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই বাংলাদেশে খ্রীষ্টের তিন চারি শত বৎসর পূর্বে রেশমের চাষ খুব হইত। রেশমের খুব ভালো কাপড়ের নাম 'পত্রোর্ণ' অর্থাৎ পাতার রেশম। পোকাতে পাতা খাইয়া যে রেশম বাহির করে, সেই রেশমের কাপড়ের নাম 'পত্রোর্ণ'। সেই পত্রোর্ণ তিন জায়গায় হইত—মগধে, পৌণ্ড্র দেশে ও সুবর্ণকুড্যে। নাগবৃক্ষ, লিকুচ, বকুল আর বটগাছে এই পোকা জন্মিত। নাগবৃক্ষের পোকা হইতে হলদে রঙের রেশম হইত, লিকুচের পোকা হইতে যে রেশম বাহির হইত তাহার রঙ গমের মতো, বকুলের রেশমের রঙ ননীর মতো, এই সকলের মধ্যে সুবর্ণকুড্যের 'পত্রোর্ণ' সকলের চেয়ে ভালো।

উপরে যেটুকু লেখা হইল, তাহা প্রায়ই অর্থশাস্ত্রের তর্জমা। যে

অংশ তর্জমা হইল তাহাতে মগধ ও পৌণ্ড্র দেশের নাম আছে। এই দুইটি দেশ সকলেই জানেন। মগধ—দক্ষিণ বিহার। আর পৌণ্ড্র—বারেন্দ্রভূমি। সুবর্ণকুড্য কোথায়? প্রাচীন টীকাকার বলেন, সুবর্ণকুড্য কামরূপের নিকট। কিন্তু কামরূপের নিকট যে রেশম এখন হয়, তাহা ভেরাণ্ডা পাতায় হয়। আমি বলি সুবর্ণকুড্যেরই নাম শেষে কর্ণসুবর্ণ হয়। কর্ণসুবর্ণ, মুর্শিদাবাদ ও রাজমহল লইয়া। এখানকার মাটি সোনার মত রাঙা বলিয়া, এ দেশকে কর্ণসুবর্ণ বা কিরণসুবর্ণ বা সুবর্ণকুড্য বলিত। এখানে এখনও রেশমের চাষ হয় এবং এখানকার রেশম খুব ভালো। নাগবৃক্ষ এখানে খুব জন্মায়। 'নাগবৃক্ষ' শব্দের অর্থ নাগকেশর গাছ। নাগকেশর বাংলার আর কোনোখানে বড়ো দেখা যায় না, কিন্তু এখানে অনেক দেখা যায়। লিকুচ মাদারগাছ। মাদারগাছেও রেশমের পোকা বসিতে পারে। বকুল ও বটগাছ প্রসিদ্ধই আছে। রেশমী কাপড় যে চীন হইতে বাংলায় আসিয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণই অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। চীনের রেশম তুঁতগাছ হইতে হয়। বাংলার রেশমের তুঁতগাছের সহিত কোন সম্পর্কই নাই। সুতরাং বাঙ্গালী যে রেশমের চাষ চীন হইতে পাইয়াছে, এ কথা বলিবার জো নাই। এখন পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইলে এই কথা বলিতে হইবে যে, রেশমের চাষ বাংলাতেও ছিল। তবে তুঁতগাছ দিয়া রেশমের চাষ চীন হইতেই সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যত্র যে রেশমের চাষ ছিল, এ কথা চাণক্য বলেন না। তিনি বলেন, বাংলায় ও মগধেই রেশমের চাষ ছিল। কারণ পৌণ্ড্র ও বাংলায়, সুবর্ণকুড্যও বাংলায়। চাণক্যের পরে কিন্তু ভারতবর্ষের নানা স্থানে রেশমের চাষ হইত।

অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা যে সংবাদ পাইলাম, সেটি বাংলার বড়োই গৌরবের কথা। যদি বাঙ্গালীরা সকলের আগে রেশমের চাষ আরম্ভ

করিয়া থাকেন তাহা হইলে তো তাঁহাদের গৌরবের সীমাই নাই। যদি চীনেই সর্বপ্রথম উহার আরম্ভ হয়, তথাপি বাঙ্গালীরা চীন হইতে কিছু না কিছু শিখিয়াই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে যে রেশমের কাজ আরম্ভ করেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কারণ তাঁহারা তো আর তুঁতপাতা হইতে রেশম বাহির করিতেন না, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। যে সকল গাছ বিনা চাষে তাঁহাদের দেশে প্রচুর জন্মায়, যে সকল গাছের পোকা হইতেই তাঁহারা নানারঙের রেশম বাহির করিতেন। চীনের রেশম সবই সাদা, তাহা রঙ করিতে হয়। বাংলার রেশম রঙ করিতে হইত না, গাছ-বিশেষের পাতার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন রঙের সুতা হইত, আর এ বিদ্যা বাংলার নিজস্ব, ইহা কম গৌরবের কথা নয়।

বাকলের কাপড়

প্রথম অবস্থায় লোকে পাতা পরিত। তাহার পর লোকে বাকল পরিত; গাছের ছাল পিটিয়া কাপড়ের মত নরম করিয়া লইত, তাহাই জড়াইয়া লজ্জা নিবারণ করিত এবং কাঁধের উপর একখানি ফেলিয়া উত্তরীয় করিত। সাঁচী পাহাড়ের উপর এক প্রকাণ্ড স্তূপ আছে, উহার চারিদিকে পাথরের রেলিং আছে, রেলিং-এর চারিদিকে বড়ো বড়ো ফটক আছে। দুই-দুইটি থামের উপর এক-একটি ফটক, এই থামের গায়ে অনেক চিত্র আছে। এই চিত্রের মধ্যে বাকল-পরা অনেক মুনিঋষি আছেন। তাঁহাদের কাপড় পরার ধরন দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি, কেমন করিয়া সেকালে লোকে বাকল পরিয়া থাকিত। তাহার পর লোকে আর বাকল পরিত না, বাকল হইতে সুতা বাহির করিয়া কাপড় বুনিয়া লইত, শণ পাট, ধঞ্চে, এমন কি অতসী গাছের ছাল হইতে সুতা বাহির করিত। এখন এই সকল সুতায় দড়ি ও থলে হয়। সেকালে উহা হইতে খুব ভালো কাপড় তৈয়ার হইত এবং অনেক কাপড় খুব ভালোও হইত। বাকল হইতে

যে কাপড় হইত তাহার নাম 'ক্ষৌম'। উৎকৃষ্ট ক্ষৌমের নাম 'দুকুল'। ক্ষৌম পবিত্র বলিয়া লোক বড়ো আদর করিয়া পরিত।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতে বাংলাতেই এই বাকলের কাপড় বুনা হইত। বঙ্গে দুকুল হইত, উহা শ্বেত ও স্নিগ্ধ, দেখিলেই চক্ষু জুড়াইয়া যাইত। পৌণ্ড্রেও দুকুল হইত, তাহার বর্ণ সূর্যের মতো এবং মণির মতো উজ্জ্বল। বাংলাতেই বাকলের কাপড় সকলের চেয়ে ভালো হইত, এবং 'দুকুল' একমাত্র বাংলাতেই হইত।

কার্পাসের কাপড়ও বাংলার একটা প্রধান গৌরবের জিনিস হইয়াছিল। ঢাকাই মস্‌লিন ঘাসের উপর পাড়িয়া রাখিলে ও রাত্রিতে তাহার উপর শিশির পড়িলে, কাপড় দেখাই যাইত না। একটা আংটির ভেতর দিয়া একখানা মস্‌লিন অনায়াসেই টানিয়া বাহির করিয়া লওয়া যাইত। তাঁতীরা অতি প্রত্যুষে উঠিয়া একটি বাখারির কাঠি লইয়া কার্পাসের ক্ষেতে ঢুকিত। ফট্ করিয়া যেমন একটি কার্পাসের মুখ খুলিয়া যাইত, অমনি বাখারিতে জড়াইয়া তাহার মুখের তুলাটি সংগ্রহ করিত। সেই তুলা হইতে সূক্ষ্ম সুতা পাকাইত। তাহাতেই মস্‌লিন তৈয়ার হইত। আকবর যখন বাংলা দখল করিয়া সুবাদার নিযুক্ত করেন, তখন সুবাদারের সহিত তাঁহার বন্দোবস্ত হয় যে, তিনি বাংলার রাজস্ব স্বরূপ বৎসরে পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র লইবেন, কিন্তু দিল্লীর রাজবাড়িতে যত মালদহের রেশমি কাপড় ও ঢাকার মস্‌লিন দরকার হইবে, সমস্ত সুবাদারকে জোগাইতে হইবে।

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া প্রাচীন বাংলার কোন্ কোন্ গৌরবের কথা জানিতে পারিলে?

২। প্রাচীন বাংলায় যে রেশম চাষ হইত তাহার প্রমাণ কী?

৩। 'ঢাকাই মস্‌লিন' কিভাবে তৈরী হইত ?

৪। পত্রোর্ণ, দুকুল, ক্ষৌম, মস্‌লিন—ইহাদের পরিচয় দাও।

৫। স্থানগুলি কিজন্য বিখ্যাত এবং কোথায় অবস্থিত লিখ :

মগধ, পৌণ্ড্র, কর্ণসুবর্ণ, সাঁচী, ঢাকা।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

৬। "অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা সংবাদ পাইলাম, সেটি বাংলার বড়ই গৌরব কথা"—এই বাক্যটি কাহার লিখিত কোন্ প্রবন্ধ হইতে উৎকলিত হইয়াছে ? 'অর্থশাস্ত্র' কী ? 'অর্থশাস্ত্র' হইতে কোন্ সংবাদ পাওয়া যায় এবং তাহাতে বাঙালীর গৌরব করিবারই বা কি আছে ?

৭। "আর, এ বিদ্যা বাংলার নিজস্ব, ইহা কম গৌরবের কথা নয়"—যে প্রসঙ্গে লেখক এই উক্তি করিয়াছেন তাহা সবিস্তারে লিখ।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৮। "কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতো বাংলাতেই এই বাকলের কাপড় বুনা হইত"—কৌটিল্যের পরিচয় দাও। অর্থশাস্ত্র কী ? 'বাকল' বলিতে কী বুঝ ?

৯। বাংলার সুবেদারের সহিত আকবরের বন্দোবস্ত কী ছিল ?

১০। রেশমের জন্মস্থান কোথায় ?

১১। কোন্ বৃক্ষের পোকা হইতে কোন্ রঙের রেশম পাওয়া যায় লিখ :

নাগবৃক্ষ, লিকুচ, বকুল, বট।

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

১২। গৌরব, আরম্ভ, প্রচুর, নিজস্ব, প্রকাণ্ড, শ্বেত, উজ্জ্বল, দখল—এই-গুলির বিপরীতার্থক শব্দ লিখ।

১৩। নিম্নের বাক্যটির সকল পদের পরিচয় দাও :

সুতরাং বাঙালী যে রেশমের চাষ চীন হইতে পাইয়াছে, একথা বলিবার জো নাই।

১৪। নিম্নরেখ পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :

(ক) কিন্তু কামরূপের নিকট যে রেশম এখন হয়, তাহা ভেরেণ্ডা পাতায় হয়।

(খ) পোকাতে পাতা খাইয়া যে রেশম বাহির করে, সেই রেশম কাপড়ের নাম 'পত্রোর্ণ।

(গ) ঢাকাই মস্‌লিন ঘাসের উপর পাড়িয়া রাখিলে ও রাত্রিতে তাহার উপর শিশির পড়িলে, কাপড় দেখাই যাইত না।

———

খাদ্য চাই

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বহিতৈষী নেভিন্‌সন-সাহেব জার্মানির বর্তমান দুর্দিন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, সেখানকার অধিবাসীরা শরীর-মনের সম্পূর্ণ তেজ রক্ষা করিবার উপযুক্ত আহার হইতে কিছুকাল ধরিয়া বঞ্চিত আছে। এই কারণে, বিশেষভাবে শিশুদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তির হ্রাস হওয়াতে সমস্ত জাতির ভাবী উন্নতির পক্ষে যে বিষম ক্ষতির কারণ ঘটিতেছে তাহাই সবচেয়ে উদ্‌বেগের কথা। শিশু-মৃত্যুসংখ্যাও সেখানে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। সেখানকার একজন ডাক্তার বলিয়াছেন, দেশে যে পরিমাণ খাদ্য আছে তাহা মানুষকে একেবারে প্রাণে মারিবার পক্ষে কিছু বেশী অথচ বাঁচাইয়া রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আলু, রুটি, মাংস ও মাখন উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে না। সামরিক শাসনে বাহির হইতে জার্মানিতে আহার-প্রবেশের পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই দেশের এই অবস্থা ঘটিয়াছে।

এই বর্ণনা পড়িয়া একটা কথা আমরা না ভাবিয়া থাকিতে পারি না। সেটা এই যে, কোন একটা জাতিকে জ্ঞানে ও কর্মে পুরাদমে উন্নতির পথে চালাইতে হইলে প্রথম হইতেই তাহাকে প্রচুর পরিমাণে আহার জোগাইতে হয়। শুধু কেবল বুদ্ধি থাকিলেই চলে না; উৎসাহ অধ্যবসায়ের জোরে সেই বুদ্ধি ষোল আনা পরিমাণে খাটাইতে হয়।

দুইটা দেশের মানুষের সংখ্যার তুলনা করিতে গেলে মাথা গুণতি করিয়া সত্য পরিমাণ পাওয়া যায় না। কোন দেশে মানুষ খাইতে পায় কত, সেটাকেও সংখ্যার সহিত যোগ করিলে তবে ঠিক ওজন পাওয়া যায়। জার্মানি যে আদর্শের সভ্যতাকে এতদিন বহন করিয়া আসিয়াছে তাহাকে পোষণ করিতে যে পরিমাণ খাদ্য লাগে সেই খাদ্য কমিয়া আসিলে তাহার মনন-শক্তি, তাহার কৃতিত্ব, তাহার ন্যাশনাল সফলতা কমিয়া আসিবে। কেননা, বড়ো সভ্যতাকে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য স্বাস্থ্য ও প্রাণ-শক্তি, উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রভূত পরিমাণে দরকার হয়, এজন্য যথেষ্ট আহার্য চাই।

এই উপলক্ষে নিজেদের দেশের কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমাদের দেশে সামরিক অবরোধ নাই, কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই যে বহুকাল ধরিয়া আধপেটা খাইয়া আসিতেছে, সে কথা সকলেই জানে। জার্মানির ডাক্তার যাহা বলিয়াছেন, আমাদের পক্ষে তাহা পুরা খাটে। আমরা যতটা খাই তাহাতে না হয় মরণ না হয় বাঁচন; কেননা, শুধু কেবল নিঃশ্বাস লওয়াকেই তো বাঁচা বলে না। শিশুর মৃত্যুসংখ্যা আমাদের দেশে খুবই বেশি। কিন্তু যে শিশু মরে না সে যে সম্পূর্ণ পরিমাণে বাঁচিয়া থাকিবার মতো আহার পায় না, সেইটাই দুঃখ। কেবলমাত্র আর্থিক দিক হইতে যদি ইহার ফল দেখি তাহা হইলে দেখা যাইবে, সবসমেত আমাদের দেশে কর্মশক্তি কম হওয়াতে অধিক মূল্য দিয়া অল্প ফল পাই। অন্য দেশে একজনে যে কাজ করে, আমাদের দেশে সে কাজে অন্তত চারজনের দরকার হয়। ইহাতে কেবল কাজের পরিমাণ নষ্ট হয় তাহা নহে, কাজের গুণও নষ্ট হয়। কেননা, কাজের শক্তি থাকিলে সেই শক্তি খাটাইতে আনন্দ হয়, কাজ ফাঁকি দিতে সহজেই ইচ্ছা হয় না। কর্ম সম্বন্ধে সেই সত্যপরতাই কাজের নৈতিক গুন। য়ুরোপীয়

মনিব প্রায়ই অভিযোগ করেন যে, আমাদের দেশের লোক ফাঁকি দেয়, তাহাদিগকে কেবলই পাহারা এবং শাসনের উপর রাখিতে হয়। বংশানুক্রমে তাঁহাদের নিজেদের দেহ সহজেই পুষ্ট বলিয়া একথা তাঁহারা মনেই করিতে পারেন না যে, এদেশে কর্তব্য এড়াইবার জন্য ইচ্ছার উৎপত্তি প্রধানতই শরীর পোষণের অভাব হইতে। দেশের লোক ম্যালেরিয়ায় মরিতেছে এবং জীবন্মৃত হইয়া আছে তাহারও কারণ ওই, শুধু বেচারা মশাকে দোষ দিলে চলিবে না। কী করিয়া আমরা বাঁচিব একথা ভাবিবার নহে, কেননা, কোন-মতে বাঁচার চেয়ে মরা ভালো—কী করিয়া আমরা পুরোপুরি বাঁচিব সেইটাই ভাবিবার কথা। কৃশতাবশত জীবনধারণে আমাদের সম্পূর্ণ গা নাই বলিয়া জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমরা গড়িমসি করিয়া ফাঁকি দিতেছি, এ সম্বন্ধে আমরা সত্যপর হইতেছি না। ইহাতে সমস্ত দেশের বাহ্যিক ও আন্তরিক যে লোকসান হইতেছে—সবস্মুদ্ধ, জড়াইয়া যে কাজ হইতেছে কম ফসল ফলিতেছে, কম বিঘ্ন কাটিতেছে প্রাণের স্রোত কম করিয়া বহিতেছে, নিজেদের উপর আস্থা কম পড়িতেছে, অঙ্ক দিয়া কি তাহার পরিমাণ পাওয়া যায়। শরীরমনের উপবাসজাত যে অবসাদ, ভীরুতা, ঔদাসীন্য, জড়ত্ব আমাদিগকে ধূলিসাৎ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার ভার কি সামান্য!

এই সব বিপত্তি হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য অর্থ কী করিয়া বাড়াইতে পারা যায় সে কথা ভাবিবার শক্তি যাঁহাদের আছে তাঁহারা ভাবুন, কিন্তু যতটুকু আমাদের ভাণ্ডারে আছে তাহার পুষ্টিকরতার বিচার করিয়া তাহার সম্বন্ধে অবিলম্বে আমাদের অভ্যাস পরিবর্তন করিতে যদি পারি তাহা হইলে এক দমে অনেকটা ফল পাওয়া যাইবে।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। জার্মানীর দুর্দিন সম্বন্ধে বিশ্বহিতৈষী নেভিন্‌সন ও জনৈক ডাক্তারের বক্তব্য নিজ ভাষায় বিবৃত কর।

২। জাতিকে সমৃদ্ধ করিয়া গড়িবার জন্য খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তাহা যুক্তিসহ আলোচনা কর।

৩। খাদ্যাভাবে নিজ দেশের মানুষের জীবনীশক্তি ও কর্মক্ষমতা কিভাবে নষ্ট হইতেছে তাহার পরিচয় প্রদান কর।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

৪। "দেশে যে পরিমাণ খাদ্য……যথেষ্ট নহে।"—এই অংশটি পাঠ্যপুস্তকের কোন্ প্রবন্ধে আছে? প্রবন্ধটি কাহার লেখা? আসলে উক্তিটি কাহার? তিনি কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলিয়াছেন?

৫। "শুধু কেবল নিঃশ্বাস লওয়াকেই তো বাঁচা বলে না"—বক্তব্যটি কাহার লেখা, কোন্ প্রবন্ধে আছে? লেখক কোন্ প্রসঙ্গে কথাটির অবতারণা করিয়াছেন? কথাটির অর্থ বুঝাইয়া লিখ।

৬। "শুধু বেচারা মশাকে দোষ দিলে চলিবে না"—কে, কোন্ প্রবন্ধে, কী প্রসঙ্গে একথা বলিয়াছেন? কথাগুলির যথার্থতা বিচার কর।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৭। "এই উপলক্ষে নিজেদের দেশের কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে"—বক্তা কে? 'এই উপলক্ষে' বলিতে কী বুঝান হইতেছে? এই দেশের কথা ভাবিয়া দেখিবার আবশ্যকতা কী?

৮। "কোনমতে বাঁচার চেয়ে মরা ভালো"—কিসের জন্য?

৯। "ইহাতে সমস্ত দেশের বাহ্যিক আন্তরিক যে লোকসান হইতেছে"—এই লোকসান কত দিক দিয়া কিভাবে হইতেছে তাহা সংক্ষেপে বল।

১০। "বড়ো সভ্যতাকে ধারণ করিবার জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তি।" —বাক্যটি প্রবন্ধানুসারে তুমি লেখ।

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

১১। শব্দগুলির শুদ্ধরূপ লেখ :

অধ্যাবসায়, সম্পূর্ণ, কৃতিত্য, আস্তা, বিশ্বহিতৈষী।

১২। শব্দযুগলের অর্থ পার্থক্য নির্দেশ কর :

বর্তমান—বর্ধমান ; দেশ—দ্বেষ ; অবরোধ—অবিরোধ ; অঙ্ক—অংক ; পরিমাণ—পরিণাম।

১৩। বিপরীত শব্দ লেখ :

দুর্দিন, উন্নতি, নিঃশ্বাস, দোষ, বাহ্যিক।

———

স্বদেশপ্রেম

স্বামী বিবেকানন্দ

আমি স্বদেশহিতৈষিতায় বিশ্বাসী। স্বদেশহিতৈষিতা সম্বন্ধে আমারও একটা আদর্শ আছে। মহৎ কার্য করিতে হইলে তিনটি জিনিসের আবশ্যক হয়। প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা, আন্তরিকতা আবশ্যক। বুদ্ধি, বিচারশক্তি আমাদিগকে কতটুকু সাহায্য করিতে পারে? উহারা আমাদিগকে কয়েক পদ অগ্রসর করে মাত্র, কিন্তু হৃদয়দ্বার দিয়াই মহাশক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে; প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে—জগতের সকল রহস্যই প্রেমিকের নিকট উন্মুক্ত। হে ভাবী সংস্কারকগণ, হে ভাবী স্বদেশহিতৈষিগণ। তোমরা হৃদয়বান হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধরগণ পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারত-গগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এই সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ, এই ভাবনায় কি নিদ্রা তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল

করিয়া তুলিয়াছে? দেশের চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে, এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-সম্পত্তি, এমন কি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিও, তোমরা প্রথম সোপান—স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপান মাত্র—পদার্পণ করিয়াছ।

মানিলাম; তোমরা দেশের কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, প্রতিকারের কোন উপায় করিয়াছ কি? লোককে গালি না দিয়া তাহাদের কোন যথার্থ সাহায্য করিতে পার কি? স্বদেশবাসীকে কিছু সান্ত্বনাবাক্য শুনাইতে পার কি? কিন্তু ইহাতেও হইল না। তোমরা কি পর্বতপ্রায় বিঘ্নবাধাকে তুচ্ছ করিয়া কার্য করিতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ তোমার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি তোমরা যাহাই সত্য ঠাওরাইয়াছ, তাহাই করিয়া যাইতে পার? যদি তোমাদের স্ত্রী-পুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, যদি তোমাদের ধন-মান সব যায়, তথাপি কি তোমরা উহা ধরিয়া রাখিতে পার? রাজা ভর্তৃহরি যেমন বলিয়াছিলেন "নীতিনিপুণ ব্যক্তিগণ নিন্দাই করুন বা স্তবই করুন, লক্ষ্মীদেবী গৃহে আসুন বা যথা ইচ্ছা চলিয়া যান, মৃত্যু আজই হউক বা যুগান্তরেই হউক, তিনিই ধীর যিনি সত্য হইতে একবিন্দুও বিচলিত হন না।" সেইরূপ নিজপথ হইতে বিচলিত না হইয়া তোমরা কি দৃঢ়ভাবে তোমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পার? তোমাদের কি এইরূপ দৃঢ়তা আছে? যদি এই তিনটি জিনিস তোমাদের থাকে, তবে তোমরা প্রত্যেকেই অলৌকিক কার্য সাধন করিতে পার। তোমাদের সংবাদপত্রে লিখিবার অথবা বক্তৃতা দিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন হইবে না। তোমাদের মুখ এক অপূর্ব স্বর্গীয় জ্যোতি ধারণ করিবে। তোমরা যদি পর্বতের গুহায় যাইয়া বাস কর, তথাপি তোমাদের চিন্তারাশি ঐ পর্বত-প্রাচীর পর্যন্ত

ভেদ করিয়া বাহির হইবে। হয়ত শত শত বর্ষ ধরিয়া উহা কোন আশ্রয় না পাইয়া সূত্রাকারে সমগ্র জগতে ভ্রমণ করিবে। কিন্তু একদিন না একদিন উহা কোন না কোন মস্তিষ্ক আশ্রয় করিবেই করিবে। তখন সেই চিন্তানুযায়ী কার্য হইতে থাকিবে। অকপটতা, সাধু অভিসন্ধি ও চিন্তার শক্তি অসামান্য।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। স্বামী বিবেকানন্দ প্রকৃত স্বদেশহিতৈষীদের প্রাথমিক কোন্ কোন্ গুণাবলী অর্জনের কথা বলিয়াছেন?

২। "যদি এই তিনটি জিনিস তোমাদের থাকে।"—কোন্ তিনটি জিনিসের কথা তিনি বলিয়াছেন? ঐ তিনটি জিনিস থাকিলে কী হইবে আর কিসের প্রয়োজন হইবে না?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

৩। 'প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে'—কে কোন্ প্রবন্ধে একথা কাহাদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন? কথাগুলির প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া লিখ।

৪। "তিনিই ধীর যিনি সত্য হইতে একবিন্দুও বিচলিত হন না।"—বক্তব্যটি কোন্ প্রবন্ধ হইতে লওয়া হইয়াছে? কে, কোন্ প্রসঙ্গে এই বক্তব্য করিয়াছিলেন? বক্তব্যটি প্রকৃত কাহার উক্তি? কথাটির অর্থ তোমার নিজ ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া লিখ।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৫। মহৎ কার্য করিতে হইলে কোন্ তিনটি জিনিসের আবশ্যক হয়?

৬। "রাজা ভর্তৃহরি যেমন বলিয়াছিলেন"—রাজার উক্তিটি পাঠ্যপুস্তকের ভাষায় অবিকল উদ্ধৃত কর।

৭। "অকপটতা, সাধু অভিসন্ধি ও চিন্তার শক্তি অসামান্য।"—বাক্যটির অর্থ একটি মিশ্রবাক্যে প্রকাশ কর।

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

৮। বিপরীত শব্দ লিখ: বিশ্বাসী, মহৎ, আবশ্যক, অগ্রসর, অসম্ভব, উন্মুক্ত, অস্থির, উপায়, সত্য, অকপটতা, অসামান্য।

৯। অর্থ লিখ ও বাক্যে ব্যবহার কর: সোপান, স্বদেশহিতৈষিতা, হৃদয়বত্তা, সান্ত্বনাবাক্য, নীতিনিপুণ, অলৌকিক, অসামান্য।

১০। তিনটি করিয়া সমার্থক শব্দ লিখ: পর্বত, জগৎ, শরীর, মস্তিষ্ক।

১১। লিঙ্গান্তর কর: প্রেমিক, ঋষি, পাগল, স্বদেশহিতৈষী, স্ত্রী, পুত্র।

নিউটনের নাম তোমরা শুনিয়া থাকিবে। তাঁহার মতো জ্ঞানী লোক এ পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন। পুরাতন হইলেও নিউটনের সম্বন্ধে একটি কথা আজ তোমাদিগকে বলিব।

আড়াই শত বৎসর পূর্বে (১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে) ইংল্যাণ্ড দেশে নিউটন জন্মিয়াছিলেন। তিনি যে বৎসর জন্মিয়াছিলেন, সেই বৎসর গ্যালিলিওর মৃত্যু হয়। গ্যালিলিও ইতালী দেশবাসী ছিলেন। গ্যালিলিওর নাম পণ্ডিত সমাজে বিখ্যাত। গ্যালিলিও পেণ্ডুলম-যুক্ত ঘড়ি বাহির করেন। গ্যালিলিও প্রথমে দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের দ্বারা আকাশ পরীক্ষা করেন। গ্যালিলিও আরও অনেক বড়ো বড়ো কাজ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি সে কথা বলিবার দরকার নাই। গ্যালিলিও খুব বড়লোক ছিলেন, কিন্তু নিউটন তাঁহার অপেক্ষাও বড়লোক।

নিউটনের প্রধান কাজ কী? তোমরা হয়ত শুনিয়া থাকিবে, নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই রকম একটা গল্প আছে যে, নিউটন একদিন এক বাগানে বসিয়া কী ভাবিতেছিলেন। এমন সময় গাছ হইতে একটা আপেল ফল নীচে

পড়িল। অমনি নিউটন স্থির করিলেন, পৃথিবীর এমন একটা ক্ষমতা আছে, যাহার দ্বারা অন্য বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে বা টানিয়া লয়। সেই ক্ষমতার নাম মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। পৃথিবীর সেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে, তাহাতেই পৃথিবী অন্যান্য দ্রব্যকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে।

এই গল্প হয়ত তোমরা শুনিয়া থাকিবে। কিন্তু গল্পে নিউটনের খ্যাতি না বাড়াইয়া বরং কমাইয়া দেয়। বস্তুতঃ নিউটন ঐরূপ একটা কাজ কিছু করেন নাই।

তবে নিউটনের বাহাদুরি কিসে? অন্য লোকে দেখে, ফলটা পৃথিবীর দিকে যাইতেছে; নিউটন প্রথমে দেখিয়াছিলেন যে, ফল যেমন পৃথিবীর দিকে যায়, পৃথিবীও ঠিক তেমনই ফলের দিকে যায়। অন্য লোকে দেখে, পৃথিবী ফলকে টানে বা আকর্ষণ করে; নিউটন দেখিয়াছিলেন, ফলটিও পৃথিবীকে টানে বা আকর্ষণ করে। শুধু তাহাই নহে। অত বড়ো প্রকাণ্ড পৃথিবী ক্ষুদ্র ফলটিকে যে বলে টানে, ক্ষুদ্র ফলটিও প্রকাণ্ড পৃথিবীকে ঠিক সেই বলে টানে। উভয়ের প্রতি টান উভয়েরই সমান।

তোমরা হয়তো জিজ্ঞাসা করিবে সে আবার কী? তবে পৃথিবী ফলের কাছে যায় না কেন? ফলই বা পৃথিবীর দিকে যায় কেন?

উত্তর এই,—পৃথিবী খুব বড়ো, তাই ফল তাহাকে টানিয়াও অধিক কাছে আনিতে পারে না। আর ফল খুব ছোট, তাই পৃথিবী সমান বলে টানিয়াও তাহাকে আপনার দিকে আনে।

আর একটা কথা নিউটন প্রমাণ করেন। যে কারণে আম, জাম, নারিকেল পৃথিবীর দিকে যায়, ঠিক সেই কারণে দূরস্থিত চন্দ্রও পৃথিবীর দিকে চলে। চন্দ্র আমাদের পৃথিবী হইতে অনেক দূরে আছে; লক্ষ ক্রোশেরও কিছু অধিক দূরে আছে। কিন্তু সেখানে থাকিয়াও

চন্দ্রের অব্যাহতি নাই। গাছের নারিকেলটা যেমন পৃথিবীতে পড়িবার চেষ্টা করিতেছে; চন্দ্রও ঠিক সেইরূপ পৃথিবীতে পড়িতে যাইতেছে। প্রভেদ এই, নারিকেলটা যতক্ষণ গাছ হইতে না খসে, ততক্ষণ উহা পড়িতে পায় না, আর বোঁটাটি ছিঁড়িয়া গেলেই পড়িয়া যায়; চন্দ্রকে কেহ ধরিয়া বা আটকাইয়া নাই, তাই চন্দ্র ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে।

যেদিন চন্দ্রের সৃষ্টি, সেইদিন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত চন্দ্র ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে, এবং চিরকালই পড়িতে থাকিবে। অথচ তোমাদের মাথা ভাঙিবার কোনও আশঙ্কা থাকিবে না।

একটা ঢেলা হাত হইতে ফেলিলে হাতের ঠিক নীচে পড়ে। বেগে সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিলে একটু দূরে পড়ে। আরও বেগে ছুঁড়িলে আরও অধিক দূরে চলিয়া তাহার পর ভূমিতে পড়ে। আমি এই পশ্চিমমুখে দাঁড়াইয়া এই জিনিসটা বেগে ফেলিলে ত্রিশ-চল্লিশ হাত দূরে গিয়া ভূমি স্পর্শ করিবে। অধিক বেগ দিতে পারিলে হয়তো, গঙ্গা পার হইয়া হাওড়াতে, না হয় গুজরাটে, না হয় মক্কায় গিয়া পড়িত। আমরা সেরূপ বেগ দিতে পারি না, তাই অত দূর যায় না। যত দূরেই যাউক, পৃথিবীতে উহাকে পড়িতেই হইত। তবে আরও অধিক বেগ দিলে পৃথিবীতে না পড়িয়া, একেবারে পৃথিবীটা ঘুরিয়া, আবার কলিকাতায় আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইত। তবে একেবারে পৃথিবীর কাছছাড়া হইতে পারিত না।

তাই মনে কর, চন্দ্রকে যেন কেহ প্রভূত বেগে পূর্বমুখে ছুঁড়িয়া দিয়াছে; তাই চন্দ্র পূর্বমুখে চলিতে চলিতে সাতাশ দিনে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আবার স্বস্থানে ঘুরিয়া আসে ও আবার চলিতে থাকে। পৃথিবীকে একেবারে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। চন্দ্রের যদি এই পূর্বমুখে বেগটুকু না থাকিত, তাহা হইলে চন্দ্র এতদিন বৃক্ষচ্যুত নারিকেলের ন্যায় পৃথিবীতে আসিয়া আঘাত করিত।

একগাছি লম্বা স্থতার এক প্রান্তে একটা ঢিল বাঁধ ও আর এক প্রান্ত বাম হাতে ধরিয়া ঝুলাইয়া দাও। তারপর ডান হাতের দুটি আঙুলে করিয়া ঢিলটিকে স্বস্থান হইতে খানিকটা সরাও ; স্থতাগাছাটি যেন বরাবর টানের উপরে থাকে। আঙুল ছাড়িয়া দিলে ঢিলটি আবার সেই স্থানেই যাইবে। কিন্তু একবার ঐরূপে সরাইয়া একটু পাশ দিয়া বেগে ছুঁড়িয়া দাও। এবার দেখ, আর স্বস্থানে যাইতে পারিবে না ; তবে স্বস্থানকে মধ্যবর্তী করিয়া তাহার চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে। চন্দ্রের অবস্থাও কতকটা সেইরূপ, রজ্জুবদ্ধ ঢিলের মতো। পৃথিবী যেন তাহার স্বস্থান। চন্দ্র সেই পৃথিবীর দিকে যাইতে চাহে ; তবে কে কবে তাহাকে পাশ দিয়া পূর্বমুখে ছুঁড়িয়া দিয়াছে, তাই স্বস্থানে—পৃথিবীর নিকট যাইতে না পারিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

নিউটন প্রমাণ করেন, পৃথিবী যেমন নারিকেলটিকে আপনার কাছে আনিবার চেষ্টা করিতেছে ; চন্দ্রকেও ঠিক সেইরূপে সেই নিয়মে আপনার নিকট আনিবার চেষ্টা করিতেছে। কলুর বলদ যেমন ঘানি-গাছে চারিদিকে বাঁধা থাকিয়া ঘুরে ; ইচ্ছা করিলেও অন্য পথে যাইতে পারে না, চন্দ্রও সেইরূপ যেন পৃথিবীতে বাঁধা থাকিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। তাহার অন্য পথে যাইবার জো নাই।

শুধু চন্দ্র কেন, স্বয়ং পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। শুধু পৃথিবী কেন বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি আরও কতকগুলি পদার্থ, কোনটা বা পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়ো কলুর বলদের মত সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। ঘুরিতেছে সত্য, সূর্যে যেন বাঁধা রহিয়াছে সত্য, কিন্তু কিরূপ দড়িতে বাঁধা আছে ; তাহা আমরা জানি না। হয়তো ভবিষ্যতে একজন নিউটন জন্মিয়া সেই দড়ি আমাদিগকে দেখাইয়া দিবেন।

নিউটন আমাদিগকে এইটুকু চিনাইয়াছেন যে, আম নারিকেল যে নিয়মে ও যেরূপ পৃথিবীতে পড়ে, চন্দ্রও ঠিক সেই নিয়মে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে, আর পৃথিব্যাদি পদার্থও ঠিক সেই নিয়মে সূর্যের চারিদিকে ঘুরে। অর্থাৎ এই যে একটা প্রকাণ্ড জগৎ, সূর্য যাহার মধ্যস্থল, সাড়ে চারি কোটি ক্রোশ দূরস্থিত পৃথিবী যে জগতের একটি সামান্য পদার্থ মাত্র, সেই জগতের সর্বত্র এক-ই নিয়মে এ উহার দিকে চলিতেছে, ও উহার দিকে চলিতেছে, এ উহাকে ঘুরিতেছে, ও উহাকে ঘুরিতেছে।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য একটি অনুচ্ছেদে সাজাইয়া লিখ।

২। "আর একটা কথা নিউটন প্রমাণ করেন"—কথাটি কি তাহা তোমার নিজ ভাষায় ব্যক্ত কর।

৩। "চন্দ্র বস্তুত ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে"—অথচ আমাদের মাথা ভাঙ্গিবার কোন আশঙ্কা নাই, ইহার কারণ লেখকের যুক্তি অনুসারে নিজ ভাষায় সাজাও।

৪। প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া প্রবন্ধটির নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

৫। টীকা লিখ :—
মক্কা, আটলান্টিক, গ্যালিলিও, বৃহস্পতি, শুক্র, আফ্রিকা।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

৬। "নিউটন এমন নির্বোধের মতো লোক ছিলেন না যে, একটা কথাকে ঘুরাইয়া বলিয়া বাহাদুরী লইবেন।"—বক্তব্যটি কোন্ প্রবন্ধ হইতে লওয়া হইয়াছে? লেখক কোন্ প্রসঙ্গে এই বক্তব্য রাখিয়াছেন? তাহা হইলে নিউটনের বাহাদুরী কিসে?

৭। "উভয়ের প্রতি টান উভয়েরই সমান"—কোন্ প্রবন্ধের কথা ? প্রবন্ধের লেখক কে ? কোন্ কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই সমাধানসূত্র টানা হইয়াছে ?

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৮। "চন্দ্রও সেইরূপ পৃথিবীতে বাঁধা থাকিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে"—কোন্‌রূপ বাঁধা থাকিয়া ?

৯। পৃথিবী ছাড়া আর কোন্ কোন্ জিনিস সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে ?

১০। "নিউটন আমাদিগকে এইটুকু চিনাইয়াছেন"—কোন্‌টুকু তাহা তোমার নিজের কথায় গুছাইয়া লিখ।

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

১১। বিপরীত শব্দ লিখ :

জ্ঞানী, পুরাতন, মৃত্যু, বিখ্যাত, ক্ষমতা, বিশ্বাস, নির্বোধ, আকর্ষণ, অগোচরে, সামান্য, সফল।

১২। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য—এই শব্দগুলির প্রতিশব্দ লিখ।

১৩। শূন্যস্থানে কথা বসাও :

(১) (ক) গ্যালিলিও — ছিলেন।
(খ) গ্যালিলিওর নাম — বিখ্যাত।
(গ) গ্যালিলিও — ঘড়ি বাহির করেন।

(২) (ক) নিউটন — ছিলেন।
(খ) নিউটনের নামও — বিখ্যাত।
(গ) নিউটন — আবিষ্কার করেন।

———

তখন রাত্রি বোধ করি এগারোটা। বেণীর চণ্ডীমণ্ডপ হইতে অনেকগুলি লোকের চাপা-গলার আওয়াজ আসিতেছিল। আকাশে মেঘ কতকটা কাটিয়া গিয়া ত্রয়োদশীর-অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। সেইখানে খুঁটিতে ঠেস দিয়া একজন ভীষণাকৃতি প্রৌঢ় মুসলমান চোখ বুজিয়া বসিয়াছিল। তাহার সমস্ত মুখের উপর কাঁচা রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে—পরণের বস্ত্র রক্তে রাঙা, কিন্তু সে চুপ করিয়া আছে। বেণী চাপা-গলায় অনুনয় করিতেছে, কথা শোন্ আকবর, থানায় চল। সাত বছর যদি না তাকে জেলে দিতে পারি ত ঘোষাল-বংশের ছেলে নই আমি। পিছনে চাহিয়া কহিল, রমা তুমি একবার বল না, চুপ ক'রে রইলে কেন?

কিন্তু রমা তেমনি কাঠের মতো নীরবে বসিয়া রহিল।

আকবর আলি একবার চোখ খুলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া কহিল সাবাস! হ্যাঁ, মায়ের দুধ খায়েছিল বটে ছোটবাবু। লাঠি ধরলে বটে!

বেণী ব্যস্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, সেই কথা বলতেই ত বলছি

আকবর! কার লাঠিতে তুই জখম হলি? সেই ছোঁড়ার, না তার সেই হিন্দুস্থানী চাকরটার?

আকবরের ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসি প্রকাশ পাইল। কহিল, সেই বেঁটে হিন্দুস্থানীটার? সে ব্যাটা লাঠির কী জানে, বড়বাবু? কি বলিস্ রে গহর, তোর পয়লা চোটেই সে বসেছিল না রে?

আকবরের দুই ছেলে অদূরে জড়সড় হইয়া বসিয়াছিল। তাহারাও অনাহত ছিল না। গহর মাথা নাড়িয়া সায় দিল, কথা কহিল না। আকবর কহিতে লাগিল, আমার হাতের চোট পেলে সে ব্যাটা বাঁচত না। গহরের লাঠিতে বাপ করে বসে পড়ল, বড়বাবু।

রমা উঠিয়া আসিয়া অনতিদূরে দাঁড়াইল। আকবর তাহাদের পিরপুরের প্রজা। সাবেক দিনে লাঠির জোরে অনেক বিষয় হস্তগত করিয়া নিয়াছে। তাই আজ সন্ধ্যার পর ক্রোধে ও অভিমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া রমা তহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বাঁধ পাহারা দিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং ভাল করিয়া একবার দেখিতে চাহিয়াছিল, রমেশ শুধু সেই হিন্দুস্থানীটার গায়ের জোরে কেমন করিয়া কি করে। সে নিজেই যে এত বড় লাঠিয়াল, এ কথা রমা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই।

আকবর রমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, তখন ছোটবাবু সেই ব্যাটার লাঠি তুলে নিয়ে বাঁধ আটক করে দাঁড়াল দিদিঠাক্‌রান, তিন বাপ-ব্যাটায় মোরা হটাতে নারলাম। আঁধারে বাঘের মতো তেনার চোখ জ্বলতি লাগল। কইলেন, আকবর, বুড়োমানুষ তুই, সরে যা। বাঁধ কেটে না দিলে সারা গাঁয়ের লোক মারা পড়বে, তাই কাটতেই হবে। তোর আপনার গাঁয়েও ত জমিজমা আছে, সমঝে দেখরে, সে বরবাদ হ'য়ে গেলে তোর ক্যামন লাগে?

মুই সেলাম ক'রে কইলাম, আল্লার কিরে ছোটবাবু, তুমি

একটিবার পথ ছাড়। তোমার আড়ালে দাঁড়িয়ে ঐ যে কয় সম্মুন্দি, মুখে কাপড় জড়ায়ে ঝপাঝপ কোদাল মারছে, ওদের মুণ্ডু কটা ফাঁক করে দিয়ে যাই।

বেণী রাগ সামলাইতে না পারিয়া কথার মাঝখানে চেঁচাইয়া কহিল, বেইমান ব্যাটারা—তাকে সেলাম জানিয়ে এসে এখানে চালাকি মারা হচ্ছে—

তাহারা তিন বাপ-ব্যাটায় একেবারে একসঙ্গে হাত তুলিয়া উঠিল। আকবর কর্কশ কণ্ঠে কহিল, খবরদার বড়বাবু, বেইমান কয়ো না। মোরা মোছলমানের ছ্যালে, সব সইতে পারি—ও পারি না।

কপালে হাত দিয়া খানিকটা রক্ত মুছিয়া ফেলিয়া রমাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, ক্যারে বেইমান কয় দিদি? ঘরের মধ্যি বসে বেইমান কইচ বড়বাবু চোখে দেখলি জানতে পারতে ছোটবাবু কি!

বেণী মুখ বিকৃতি করিয়া কহিল, ছোটবাবু কি? তাই থানায় গিয়ে জানিয়ে আয় না। বলবি, তুই বাঁধ পাহারা দিচ্ছিলি, ছোটবাবু চড়াও হয়ে তোকে মেরেছে।

আকবর জিভ কাটিয়া বলিল তোবা তোবা, দিনকে রাত করতি বল বড়বাবু?

বেণী কহিল, না হয় আর কিছু বলবি। আজ গিয়ে জখম দেখিয়ে আয় যা—কাল ওয়ারেণ্ট বার করে একেবারে হাজতে পুরব। রমা তুমি ভাল ক'রে আর একবার বুঝিয়ে বল না, এমন সুবিধে যে আর কখনো পাওয়া যাবে না।

রমা কথা কহিল না, শুধু আকবরের মুখের প্রতি একবার চাহিল। আকবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না দিদিঠাকৃরান্, ও পারব না।

বেণী ধমক দিয়া কহিল, পারবি নে কেন?

এবার আকবরও চেঁচাইয়া কহিল, কি কও বড়বাবু, সরম নেই

মোর ? পাঁচখানা গাঁয়ের লোকে মোরে সর্দার কয় না ? দিদ্‌ঠাক্‌রান তুমি হুকুম করলে আসামী হ'য়ে জ্যাল খাট্‌তি পারি, ফৈরিদি হব কোন্‌ কালামুয়ে ?

রমা মৃদুকণ্ঠে একবার মাত্র কহিল, পারবে না আকবর ?

আকবর সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, না দিদ্‌ঠাক্‌রান, আর সব পারি, সদরে গিয়ে গায়ের চোট্‌ দেখাতে পারি না। ওঠ রে গহর, এবার ঘরকে যাই। মোরা নালিশ করতি পারব না—বলিয়া তাহারা উঠিবার উপক্রম করিল।

বেণী ক্রুদ্ধ নিরাশায় তাহাদের দিকে চাহিয়া দুই চোখে অগ্নিবর্ষণ করিয়া মনে মনে অকথ্য গালিগালাজ করিতে লাগিল এবং রমার একান্ত নিরুদ্যম স্তব্ধতার কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তুষের আগুনে পুড়িতে লাগিল। সর্বপ্রকার অনুনয়, বিনয়, ভৎ‍র্সনা, ক্রোধ উপেক্ষা করিয়া আকবর আলি ছেলেদের লইয়া, যখন বিদায় লইয়া গেল, রমার বুক চিরিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া অকারণে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল এবং আজিকার এত বড় অপমান ও তাহার সম্পূর্ণ পরাজয়েও কেন যে কেবলই মনে হইতে লাগিল তাহার বুকের উপর হইতে একটা অতি গুরুভার পাষাণ নামিয়া গেল ; ইহার কোন হেতুই সে খুঁজিয়া পাইল না।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। এই কাহিনীতে আকবরের চরিত্রে যে দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। কাহিনীটি পাঠ করিয়া আকবর ও বেণীর চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা কর এবং কাহাকে তোমার ভাল লাগে লিখ।

৩। "আকবর রমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল......"—যে কথা আকবর রমাকে বলিয়াছিল তাহা অবিকল উদ্ধৃত কর।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

৪। "সে নিজেই যে এত বড় লাঠিয়াল, একথা রমা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই।"—এই বাক্যটি কোন্ গল্পে আছে? গল্পের লেখক কে? এখানে 'সে' বলিতে কাহাকে বুঝাইতেছে? 'লাঠিয়াল' বলিতে কী বুঝ? সে ব্যক্তি যে লাঠিয়াল তাহা রমা কিভাবে বুঝিতে পারিল?

৫। "খবরদার বড়বাবু, বেইমান কয়ো না; মোরা মোছলমানের ছ্যালে, সব সইতে পারি—ও পারি না।"—উক্তিটি কার? সত্যই কি সে বেইমানী করে নাই? বক্তার চরিত্রের কোন্ দিক প্রতিফলিত হইয়াছে?

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৬। "আল্লার কিরে ছোটবাবু"—'আল্লার কিরে' বলতে কী বুঝ?

৭। 'ঐ যে কয় সম্মুদ্দি'—একথার অর্থ কী?

৮। "দিনকে রাত করতি বল বড়বাবু"—দিনকে রাত করা কিরূপ কাজ?

৯। "তুষের আগুনে পুড়িতে লাগিল"—তুষের আগুনে পোড়া বলিতে কি বুঝ?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

১০। অর্থ লিখ ও বাক্যে ব্যবহার কর:

পয়লা চোটেই, হটাতে নারলাম, কাঠের মত নীরব, মায়ের দুধ খায়েছিল বটে, কালামুয়ে।

১১। নিম্নরেখ পদের কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর:

(ক) গহরের লাঠিতে বাপ্ করে বসে পড়ল, বড়বাবু!

(খ) আঁধারে বাঘের মত তেনার চোখ জ্বলতি লাগল।

(গ) তুষের আগুনে পুড়তে লাগল?

১২। নিম্নের কথাগুলি কোন্ ভাষা হইতে বাংলা ভাষায় আসিয়াছে লিখ

বরবাদ, বেইমান, আসামী, ওয়ারেন্ট, ফৈরিদি।

———

দিকচক্রবাল দীর্ঘ নীলরেখার মতো পরিদৃশ্যমান পাহাড় ও বন—দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যায় মনের মধ্যে কত স্বপ্ন আনে। সমস্ত অরণ্যভূমি আমার কাছে পরীর দেশ বলিয়া মনে হয়। ইহার জ্যোৎস্না, ইহার নির্জনতা, ইহার নীরব রহস্য, ইহার সৌন্দর্য, পাখির ডাক, ফুলের শোভা সবই মনে হয় অদ্ভুত ; মনে এক অপূর্ব শান্তি ও আনন্দ আনিয়া দেয়।

একদিন পাহাড় দেখিব বলিয়া আমি ও সুজন সিং বাহির হইলাম। নয় মাইল ঘোড়ায় গিয়া দুই দিকের দুই শৈলশ্রেণীর মাঝের পথ ধরিয়া চলি। শৈলসানু বনে ভরা, পথের ধারে দুই দিকের বিচিত্র ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়া সরু পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, মাঝে মাঝে ছোট ছোট পার্বত্য ঝরনা উপলাস্তৃত পথে বহিয়া চলিয়াছে। বন্য চন্দ্রমল্লিকা ফুটিতে দেখি নাই। কারণ তখন শরৎকাল ; চন্দ্রমল্লিকা ফুটিবার সময়ও নয় ; কিন্তু অজস্র বন্য শেফালী বৃক্ষ বনের সর্বত্র ফুলের খই ছড়াইয়া রাখিয়াছে।

ক্রমে পথটার দু'ধারে বন ঘনাইয়া পথটাকে যেন দু'দিক হইতে চাপিয়া ধরিল। বড় বড় গাছের ডালপালা পথের উপর চন্দ্রাতপের সৃষ্টি করিল। ঘনসন্নিবিষ্ট কালো কালো গাছের গুঁড়ি, তাহাদের তলায় ঠেলিয়া ক্রমশ নানা জাতীয় ফার্ন। চাহিয়া দেখিলাম, পথটা উপরের দিকে উঠিতেছে, বন আরও কৃষ্ণায়মান। সামনে উত্তুঙ্গ শৈলচূড়া। অপূর্ব গম্ভীর শোভা এই জায়গাটায়। পথ বাহিয়া পাহাড়ের উপরে অনেক দূর উঠিলাম, পথটা আবার নামিয়া গড়াইয়া গিয়াছে। কিছুদূর নামিয়া আসিয়া একটা পিয়াল-তলায় ঘোড়া বাঁধিয়া আমরা শিলাখণ্ডে বসিলাম —উদ্দেশ্য, শ্রান্ত অশ্বকে কিছুক্ষণ বিশ্রামের অবকাশ দেওয়া।

চুপ করিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কাছেই বনের মধ্যে কোথায় একটা ঝরনার কলমর্মর সেই শৈলমালাবেষ্টিত বনানীর গভীর নিস্তব্ধতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আমার চারিধারেই উঁচু উঁচু শৈলচূড়া, তাহাদের মাথায় শরতের ঘন নীল আকাশ। কতকাল হইতে এই বন পাহাড় একরকমই আছে। সুদূর অতীতে আর্যেরা 'খাইবার' গিরিবর্ত্ম পার হইয়া প্রথম যেদিন পঞ্চনদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই বন তখন এই রকমই ছিল। বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ করিয়া যে রাত্রে গৃহত্যাগ করেন, সেই অতীত রাত্রিটিতে এই গিরি-চূড়া গভীর রাত্রির চন্দ্রালোকে আজকালের মতোই হাসিত। তমসা-তীরের পর্ণকুটিরে কবি বাল্মীকি একমনে রামায়ণ লিখিতে লিখিতে চমকিয়া উঠিয়া দেখিয়াছিলেন সূর্য অস্তাচলচূড়াবলম্বী, তমসার কালো জলে রক্তমেঘস্তূপের ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, আশ্রম-মৃগ আশ্রমে ফিরিয়াছে, সেদিনটিতেও পশ্চিম দিগন্তের শেষ রাঙা আলোয় শৈলচূড়া ঠিক এমনি অনুরঞ্জিত হইয়াছিল,—আজ আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে যেমন হইয়া আসিতেছে। সেই কত কাল আগে যেদিন চন্দ্রগুপ্ত প্রথম সিংহাসনে আরোহণ করেন, রাজকন্যা সংযুক্তা

যে দিন স্বয়ংবরসভায় পৃথ্বীরাজের মূর্তির গলায় মাল্যদান করেন, সামুগড়ের যুদ্ধে হারিয়া হতভাগ্য দারা যে রাত্রে আগ্রা হইতে গোপনে দিল্লী পলাইলেন, যে দিনটিতে পলাশী যুদ্ধ হইল—ঐ শৈলচূড়া এই বনানী ঠিক এমনি ছিল। তখন কাহারা বাস করিত এই সব জঙ্গলে? জঙ্গলের অনতিদূরে একটা গ্রামে দেখিয়া আসিয়াছিলাম কয়েকখানি মাত্র খড়ের ঘর আছে, মহুয়াবীজ ভাঙ্গিয়া তৈল বাহির করিবার জন্য দুখণ্ড কাঠের তৈরী একটা ঢেঁকির মতো কী আছে, আর এক বুড়িকে দেখিয়াছিলাম তাহার বয়স আশি-নব্বই হইবে, শণের নুড়ি চুল, গায়ে খড়ি উড়িতেছে, রৌদ্রে বসিয়া বোধ করি মাথার উকুন বাছিতেছিল। এখানে বসিয়া সেই বুড়িটার কথা মনে পড়িল। এ অঞ্চলে বন্য সভ্যতার প্রতীক ঐ প্রাচীন বৃদ্ধা—উহারই পূর্বপুরুষেরা এই বনজঙ্গলে বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছে, যীশুখ্রীষ্ট যেদিন ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন সেদিন উহারা মহুয়াবীজ ভাঙ্গিয়া যেরূপ তৈল বাহির করিত, আজ সকালেও সেইরূপ করিয়াছে। হাজার হাজার বৎসর মুছিয়া অতীতের ঘন কুজ্ঝটিকায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, উহারা আজও সেকালের মতো সাতনলি দিয়া পাখি-শিকার করিতেছে।

অতীতে কোনও দিনে, এই যেখানে বসিয়া আছি, এখানে ছিল মহাসমুদ্র। প্রাচীন সেই মহাসমুদ্রের ঢেউ আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িত এই বালুকাময় তীরে—এখন যাহা বিরাট পর্বতে পরিণত হইয়াছে। এই ঘন অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়া অতীত যুগের সেই নীল সমুদ্রের স্বপ্ন দেখিলাম।

এই বালুপ্রস্তরের শৈলচূড়ায় সেই বিস্মৃত অতীতের মহাসমুদ্র বিক্ষুব্ধ উর্মিমালার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে—অতি স্পষ্ট সেই চিহ্ন। ভূতত্ত্ববিদের চোখে ধরা পড়ে। মানুষ ছিল না, এ ধরনের গাছপালাও

ছিল না; যে ধরনের গাছপালা জীবজন্তু ছিল, পাথরের বুকে তাহাদের ছাঁচ রাখিয়া গিয়াছে, যে কোন মিউজিয়ামে গেলে দেখা যায়।

বৈকালের রোদ রাঙা হইয়া আসিয়াছে। শেফালি বনের গন্ধে-ভরা বাতাসে হেমন্তের হিমের ঈষৎ আমেজ। আর এখানে বিলম্ব করা উচিৎ হইবে না, সম্মুখে কৃষ্ণা-একাদশীর রাত্রি। আমরা আবার ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। এই প্রবন্ধে লেখক পার্বত্য অঞ্চলের একটি শোভা আঁকিয়াছেন।—শোভাটি নিজ ভাষায় বর্ণনা কর।

২। পর্বতের চূড়া দেখিয়া লেখকের মনে অতীত যুগের যে যে কথা জাগিতেছে তাহার একটি নিখুঁত ছবি তোমার ভাষায় লিপিবদ্ধ কর।

৩। টীকা লেখ:

থাইবার, গিরিবর্ত্ম, বাল্মীকি, পৃথ্বীরাজ, সংযুক্তা, পলাশী, যীশুখ্রীষ্ট, মিউজিয়াম।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

৪। "সমস্ত অরণ্যভূমি আমার কাছে পরীর দেশ বলিয়া মনে হয়।"—উক্তিটি কাহার রচিত, কোন্ রচনা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে? লেখক অরণ্য-ভূমিকে পরীর দেশ বলিয়া মনে করিয়াছেন কেন?

৫। "এই ঘন অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়া অতীত যুগের সেই নীল সমুদ্রের স্বপ্ন দেখিলাম।—বক্তা কে? অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়া নীল সমুদ্রের স্বপ্ন তিনি কিভাবে দেখিলেন?

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৬। পিয়াল-তলায় ঘোড়া বাঁধিয়া লেখক কোথায় বসিলেন? বসিবার উদ্দেশ্য কী ছিল?

৭। আর্যেরা কোন্ পথে পঞ্চনদে প্রবেশ করিয়াছিলেন? 'পঞ্চনদ' বলিতে কী বুঝ?

৮। কবি বাল্মীকি কোথায় বসিয়া রামায়ণ রচনা করেন?

৯। দারা কোন্ যুদ্ধে হারিয়া আগ্রা হইতে কোথায় পালাইয়া যান?

১০। লেখক কোন্ দৃশ্য দেখিয়া যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধের দিনের কথা মনে করিয়াছিলেন?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

১১। অর্থ লিখ ও বাক্যে ব্যবহার কর ঃ
দিকচক্রবাল, শৈলসানু, কুজ্ঝটিকা, উর্মিমালা, অনুরঞ্জিত, গিরিবর্ত্ম, পরিদৃশ্যমান, উত্তুঙ্গ।

১২। পদান্তর কর ঃ
নির্জনতা, নিস্তব্ধতা, অনুরঞ্জিত, নিশ্চিহ্ন, পরিণত, বিলম্ব।

১৩। সমাস লিখ ঃ
উপলাস্তৃত, চন্দ্রাতপ, ঘনসন্নিবিষ্ট, শৈলমালাবেষ্টিত, চন্দ্রালোক, অস্তাচল, চূড়াবলম্বী, রক্তমেঘস্তূপ, কৃষ্ণা-একাদশী, পঞ্চনদ।

দেশবন্ধুর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের সকল কথা আমি অবগত নই। জীবনচরিতের মধ্যে যে সব কথা আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও বোধ হয় আমি জানি না। তাঁহার জীবনের মাত্র তিন বৎসর কাল আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম এবং অনুচর হইয়া তাঁহার কাজ করিয়াছিলাম। এই সময়ের মধ্যেও চেষ্টা করিলে তাঁহার নিকট অনেক কিছু শিখিতে পারিতাম, কিন্তু চোখ থাকিতে কি আমরা চোখের মূল্য বুঝি ? বিশেষত দেশবন্ধু সম্বন্ধে আমার ধারণা ও বিশ্বাস ছিল যে, তিনি অন্তত আরো কয়েক বৎসর জীবিত থাকিবেন এবং তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপন না হওয়া পর্যন্ত তিনি মর্ত্যলোকের কর্মভূমি হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন না। দেশবন্ধু নিজের কোষ্ঠিকে খুব বিশ্বাস করিতেন। আমি অবিশ্বাসী হইলেও তাঁহার বিশ্বাস যে আমার মনের উপর সংক্রামক প্রভাব বিস্তার করে নাই, একথা বলিতে পারি না। আমার যতদূর স্মরণ আছে তিনি বহুবার আমায় বলিয়াছিলেন যে, সমুদ্রপারে দুই বৎসর কারাবাস তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে। কারাবাসের অবসানে তিনি সসম্মানে প্রত্যাবর্তন করিবেন ; কর্তৃপক্ষের সহিত

মিটমাট হইবে এবং তিনি রাজসম্মানে ভূষিত হইবেন ; তারপর তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিবে। সে সময়ে আমি বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার সহিত সমুদ্রপারে যাইতে আমিও প্রস্তুত। সত্য কথা বলিতে কি, সমুদ্রপারে আসার পর তাঁহার কোষ্ঠির কথা স্মরণ করিয়া আমার মনে সর্বদা আশঙ্কা হইত—পাছে তাঁহাকেও আসিতে হয়, কিন্তু সে দুর্ভাগ্য অপেক্ষা শতগুণে দারুণ দুর্ভাগ্য বাঙলার, তথা ভারতের ভাগ্যে ঘটিল।

দেশবন্ধুর সহিত আমার শেষ দেখা আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। আরোগ্যলাভের জন্য এবং বিশ্রাম পাইবার ভরসায় তিনি সিমলা পাহাড়ে গিয়াছিলেন, আমাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সিমলা হইতে রওনা হইয়া কলিকাতায় আসেন। আমাকে দেখিতে তিনি আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে দুইবার আসেন এবং আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয় আমার বহরমপুর জেলে বদলি হইবার পূর্বে। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ হইলে আমি তাঁহার পায়ের ধূলো লইয়া বলিলাম, "আপনার সঙ্গে আমার বোধহয় অনেক দিন দেখা হইবে না।" তিনি তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ও উৎসাহের সহিত বলিলেন, "না, আমি তোমাদের শিগ্‌গির খালাস করে আনছি।" হায়, তখন কে জানিত যে ইহজীবনে আর তাঁহার দর্শন পাইব না ?...

জনমণ্ডলীর উপর দেশবন্ধুর অতুলনীয় অলৌকিক প্রভাবের গূঢ় কারণ কী—অনেকে এ প্রশ্নের সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমি সর্বপ্রথমে অনুচর হিসাবে তাঁহার প্রভাবের একটি কারণ নির্দেশ করিতে চাই। আমি দেখিয়াছি তিনি সর্বদা মানুষের দোষগুণ বিচার না করিয়া তাহাকে ভালবাসিতে পারিতেন। যাহাদিগকে আমরা সাধারণত ঘৃণায় ঠেলিয়া ফেলি, তিনি তাহাদিগকে বুকে টানিয়া লইতে পারিতেন। তাঁহার সহকর্মীরা ছিলেন তাঁহার পরিবারবর্গের অন্তর্ভূক্ত। তিনি তাহাদের উপকার অথবা মঙ্গলের জন্য কী না

করিতে প্রস্তুত ছিলেন? জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না—এ কথা একশ'বার সত্য। দেশবন্ধুর জীবন ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।...

সাধারণ সাংসারিক জীবের ন্যায় দেশবন্ধুর আত্মপর-জ্ঞান ছিল না। তাঁহার বাড়ি সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার অন্তরের এবং বাহিরের সম্পদের উপর দাবি ছিল। তিনি তাঁহার অনুচরবৃন্দকে যে শুধু ভালবাসিতেন তাহা নয়, তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা সহিতেও প্রস্তুত ছিলেন। একদিন তাঁহার একজন নিকট আত্মীয় তাঁহার কোনও সহকর্মীর দোষ ও ত্রুটির উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "I hate him."—আমি তাকে ঘৃণা করি। তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "আমার মুশকিল এই যে আমি তাকে ঘৃণা করিতে পারি না।"

তিনি যে পর্বতের ন্যায় অটল সঙ্ঘ গঠন করিয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল নায়ক ও অনুচরবর্গের মধ্যে প্রাণের সংযোগ। ইহা ব্যতীত দোষগুণনির্বিশেষে ভালোবাসিবার ক্ষমতার সাহায্যে এবং তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশলের দ্বারা তিনি ভিন্ন ভিন্ন পন্থী ও ভিন্ন রুচির লোকদিগকে একত্র চালাইতে পারিতেন। তাঁহার দলের অন্তর্ভূক্ত নহেন অথবা তাঁহার মত পোষণ করেন না এরূপ বহু লোক গোপনে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন।

দেশবন্ধু যে সহজ ও অনাবিল রসিকতার অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন একথা জেলখানায় ভালো রকম বুঝিতে পারি। কত রকমের রসিকতার দ্বারা তিনি দিনের পর দিন সকলকে আমোদিত করিয়া রাখিতেন। প্রেসিডেন্সি জেলে আমাদের পাহারার জন্য সঙ্গিনধারী গুর্খা সৈনিক নিযুক্ত হইয়াছিল। একদিন সকালে উঠিয়া তিনি দেখিলেন গুর্খা সৈনিকের পরিবর্তে একজন রুলধারী হিন্দুস্থানী সিপাহী উপস্থিত। অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি হে সুভাষচন্দ্র, শেষটা অসি ছেড়ে বাঁশী; আমরা কি এতই নিরীহ?"

ভারতে হিন্দু জননায়কদের মধ্যে দেশবন্ধুর মতো ইসলামের এত বড়ো বন্ধু আর কেহ ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। তিনি হিন্দুধর্মকে এত ভালবাসিতেন যে, তার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন অথচ তাঁর মনের মধ্যে গোঁড়ামি আদৌ ছিল না। তিনি শিক্ষার (Culture) দিক দিয়া হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করিতেন। হিন্দু শিক্ষা ও ইসলামীয় শিক্ষার (Culture) মধ্যে কোথায় মিল পাওয়া যায় এ বিষয়ে কারাগারে মৌলানা আক্রাম খাঁর সহিত তাঁহার প্রায়ই আলোচনা হইত।...

জেলখানার আর একটি ঘটনার উল্লেখ আমি এস্থলে না করিয়া পারি না—কয়েদীর প্রতি তাঁহার ভালোবাসা। আমরা যে সময়ে প্রেসিডেন্সি জেল হইতে আলিপুর জেলে স্থানান্তরিত হই, সে সময়ে আলিপুর জেলে আমাদের ওয়ার্ডে (Ward) মথুর নামে একজন কয়েদী কাজ করিত। জেলের ভাষায় যাহাকে বলে "পুরানো চোর" মথুর তাহাই ছিল। আট-দশবার সে জেলখানায় ঘুরিয়াছে। কিছুদিন কাজকর্ম করিবার পর দেশবন্ধুর উপর মথুরের ভক্তি ও ভালবাসা জন্মিল—সে তাঁহাকে বাবা বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

মথুরের প্রতিও দেশবন্ধুর সমবেদনা ও ভালোবাসা জাগরিত হইল। মথুর তাহার জীবনের সকল ইতিহাস তাঁহাকে বলিত। মুক্তির সময় নিকটবর্তী হইলে দেশবন্ধু তাহাকে বলিলেন যে তাহার খালাসের পর তিনি তাহাকে নিজের বাড়িতে রাখিবেন, যেন সে অসৎ সঙ্গে পড়িয়া পুনরায় ডাকাতিতে মন না দেয়। মথুরের খালাসের দিন দেশবন্ধু লোক পাঠাইয়া তাহাকে জেলখানা হইতে নিজের বাড়িতে লইয়া আসেন।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। "জনমণ্ডলীর উপর দেশবন্ধুর অতুলনীয় অলৌকিক প্রভাবের" কারণগুলি লেখকের বক্তব্য অনুসারে লিখ।

২। "দেশবন্ধুর আত্ম-পর জ্ঞান ছিল না।"—উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর।

৩। "দেশবন্ধু যে সহজ ও অনাবিল রসিকতার অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন"—তাহার প্রমাণ দাও।

৪। "ভারতে হিন্দু জননায়কদের মধ্যে দেশবন্ধুর মতো ইসলামের এত বড়ো বন্ধু আর কেহ ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না"—দেশবন্ধুর কোন্ কার্য এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

৫। "জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না"—কোন্ কাহিনী হইতে এই উক্তিটি লওয়া হইয়াছে? কাহিনীকার কে? উক্তিটির সত্যতা সাপেক্ষে যুক্তি দেখাও।

৬। "তিনি যে……প্রাণের সংযোগ"—কে কোন্ প্রসঙ্গে এই কথার অবতারণা করিয়াছেন? 'পর্বতের ন্যায় অটল' ও 'প্রাণের সংযোগ' বলিতে কি বুঝ?

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৭। "দেশবন্ধু নিজের কোষ্ঠিকে খুব বিশ্বাস করিতেন"—'কোষ্ঠি' কি জিনিস? দেশবন্ধুর কোষ্ঠিতে কি কি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ ছিল?

৮। "কয়েদীর প্রতি দেশবন্ধুর ভালবাসা ছিল"—কয়েদী মথুরের প্রতি তাঁহার ব্যবহার বর্ণনা করিয়া সংক্ষেপে উক্তিটির সত্যতা প্রমাণ কর।

৯। দেশবন্ধুর সহিত সুভাষচন্দ্রের শেষ দেখা হয় কোথায়? তখন উভয়ের মধ্যে কি কি কথাবার্তা হইয়াছিল?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

১০। সন্ধিবিচ্ছেদ কর ও সূত্র লেখ:
কারাবাস, প্রত্যাবর্তন, দুর্ভাগ্য, প্রত্যক্ষ, উল্লেখ।

১১। ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ:
অবিশ্বাসী, অতুলনীয়, অলৌকিক, অনাবিল, অফুরন্ত।

১। বহুবচনে কি রূপ হইবে লিখ:
অনুচর, পরিবার, নায়ক, সহকর্মী, সৈনিক, কয়েদী, সিপাহী।

———

আমাদের দেশ এই ভারতবর্ষ, আমাদের পিতৃভূমি, আমাদের মাতৃস্বরূপিণী। এই দেশে আমাদের পিতৃপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই দেশেই তাঁহারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তিতে আমাদের এই বিরাট ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান—এ সমস্তের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা যে গৌরব অর্জন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বংশধর বলিয়া আমরাও সেই গৌরবেয় অংশীদার।

খালি ভারতবর্ষের মধ্যেই তাহাদের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল না। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষের বাহিরেও তাঁহারা যাইতেন এবং ভারতের বাহিরের নানা দেশেও তাঁহাদের কীর্তিকলাপ আমরা এখনও দেখিতে পাই। তাঁহারা প্রথমতঃ কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই এই সকল দেশে যাইতেন। তাহার পরে, এ-দেশের যোগীরা, এ-দেশের ব্রাহ্মণ ও আচার্যেরা, এ-দেশের বুদ্ধদেব মানুষের কল্যাণের জন্য যে সব অমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন সেই সব উপদেশও

ইঁহারা ভারতের বাহিরের নানা দেশে প্রচার করিতে লাগিলেন। বাহিরের দেশের লোকেরা তাঁহাদের কথা শুনিল। তাহারা আদরের সঙ্গে আমাদের ঋষিদের ও ব্রাহ্মণদের ধর্ম ও উপদেশ এবং বুদ্ধদেবের উপদেশ গ্রহণ করিল। আমাদের দেশের ধর্ম ও চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পুরাণকথা ও কাহিনী, আমাদের আচার, অনুষ্ঠান, আমাদের মন্দির গঠন-প্রণালী, আমাদের শিল্প, আমাদের সঙ্গীত ও নৃত্য, এ সমস্তও গ্রহণ করিল; এবং এগুলিকে নিজের রুচির অনুরূপ করিয়া একটু-আধটু অদল-বদল করিয়া, নিজেদেরও অনেক জিনিস মিশাইয়া একেবারে নিজস্ব করিয়া লইল। এই আমাদের দেশের লোকেদের সঙ্গে মিলিয়া ভারতবর্ষের বাহিরের বহু দেশ নিজ নিজ জাতীয় সভ্যতাকে গড়িয়া তুলিল, অথবা ভারতের সভ্যতা, ধর্ম-রীতিনীতি দ্বারা নিজেদের পূর্বেকার সভ্যতাকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিল। এই সকল দেশের কতকগুলি আবার ভারতবর্ষের সভ্যতা, ধর্ম, পুরাণকথা শিল্প প্রভৃতিকে এতটা আপনার করিয়া লইল যে, নিজেদের দেশকে ভারতবর্ষের যেন একটা অঙ্গ বা অংশস্বরূপ করিয়া ফেলিল।

ভারতবর্ষের বাহিরে নানা দেশে এইরূপে যে সকল নূতন ভারতবর্ষ গড়িয়া উঠিয়াছিল, আমরা সেগুলিকে একসঙ্গে 'বৃহত্তর ভারত' বলি। দুই হাজার বছরের আগে থেকেই এই 'বৃহত্তর ভারত' গড়িতে আরম্ভ করে।

বৃহত্তর ভারতে ভারতীয়দিগের তিনটি বড় বড় কীর্তি আছে। এই কীর্তি তিনটি হইতেছে তিনটি বিরাট মন্দির—একটি কম্বোজে অবস্থিত, বাকি দুইটি যবদ্বীপে অবস্থিত। কম্বোজের মন্দিরটি অঙ্কোরভটের মন্দির নামে খ্যাত, যবদ্বীপের একটি মন্দির বরবুদুর নামে বিখ্যাত। ইহা একটি বিরাট বৌদ্ধস্তূপ, তৃতীয়টি যবদ্বীপের অন্তর্গত প্রাম্বানানের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মন্দির।

কম্বোজে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব হইতেই ভারতীয়গণের যাতায়াত ছিল। ভারতবর্ষের মত কম্বোজে শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, উমা, গণেশ, কার্তিক প্রভৃতি দেবতা পূজিত হইতেন। কম্বোজের অন্তর্গত অঙ্কোরভটের মন্দির ভারতের বাহিরে হিন্দু-শিল্পের এক আশ্চর্য কীর্তি। মন্দিরটি সমচতুষ্কোণ এবং বিশাল। এই মন্দিরের ভিতরের দেয়াল অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি ছাদযুক্ত টানা বারান্দা আছে। এইসব বারান্দায় ভারতীয় রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের ঘটনাবলী ক্ষোদিত রহিয়াছে। কম্বোজের শিল্প ভারতের শিল্পেরই রূপান্তর। ভারতীয় উপাখ্যান কী সুন্দরভাবে সমস্ত খুঁটিনাটির সহিত চিত্রিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে বিস্ময়ে নির্বাক হইতে হয়।

বরবুদুর স্তূপ বা চৈত্য মধ্য যবদ্বীপে বিদ্যমান। বরবুদুর ঠিক মন্দির নহে। বুদ্ধ বা অন্য মহাপুরুষের মৃত্যুর পর, তাঁহার অঙ্গবিশেষ বা কেশাদি—দেহের কোন অংশ মাটিতে সমাহিত করিয়া তাহার উপরে প্রস্তরস্তূপ নির্মাণ করা হইত। বরবুদুরের স্তূপটি সেইরূপ একটি সমাধি।

বরবুদুরের বারান্দার গায়ে এবং স্তূপ বা চৈত্যের গায়ে পাথরের খোদাই করা চিত্রের শ্রেণী। চিত্রগুলি বুদ্ধদেবের জীবনী ও নানা বৌদ্ধ উপাখ্যান হইতে গৃহীত। এগুলিও সংখ্যায় এত বেশী যে ইহাদিগকে পাশাপাশি সাজাইলে কয়েক মাইল ইহাদের সারি হয়।

বারান্দাগুলিতে মাঝে মাঝে কুলুঙ্গি এবং ঘণ্টার আকারবিশিষ্ট গম্বুজ আছে। উহার ভিতরে বিস্তর বুদ্ধমূর্তি আছে। এই মূর্তিগুলি অতি সুন্দর।

বরবুদুরের ভাস্কর্য অপূর্ব সুন্দর জিনিস। বুদ্ধমূর্তিগুলির সুঠাম গঠন এবং ইহাদের অতি স্নিগ্ধ অথচ গম্ভীরভাবদ্যোতক গতি-ভঙ্গি ভারতবর্ষের শিল্পেও দুর্লভ।

বরবুদুরের মত প্রাম্বানান মধ্য-যবদ্বীপে অবস্থিত। সেখানে একটি প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানে তিনটি সু-উচ্চ মন্দির রহিয়াছে। একটি মন্দির বিষ্ণুর, একটি শিবের, একটি ব্রহ্মার। প্রাম্বানানের তিনটি দেবমূর্তি এখনও বিদ্যমান।

হিন্দু-যবদ্বীপের মূর্তিশিল্প যে অনুপম ছিল তাহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বুদ্ধ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধমূর্তি হইতে বেশ বোঝা যায়। প্রাম্বানানের মন্দিরে একটি প্রধান লক্ষণীয় বিষয়—তিনটি মন্দিরের বারান্দায় আলিসার পাথরে খোদা কৃষ্ণ-চরিত্রের ও রামায়ণের ছবি। ভারতবর্ষেও এত সুন্দর রামায়ণ ও কৃষ্ণ-কথার ছবি কোথাও চিত্রিত হয় নাই। বিষ্ণুর মন্দিরে আছে কৃষ্ণ-কথার ছবি। শিবের ও ব্রহ্মার মন্দিরে আছে রামায়ণের ছবি।

আমাদের দেশে যেমন আমরা শ্রীরামচন্দ্রকে সম্মান করি, যবদ্বীপীয়েরা বরাবরই তদ্রূপ করিয়া আসিয়াছে। রামের মূর্তি তাহারা সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছে। প্রাম্বানানের শিল্প হিন্দু-শিল্পজগতে প্রথম শ্রেণীর শিল্প।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। 'বৃহত্তর ভারত' কিভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল? লেখকের যুক্তি অনুসারে তোমার বক্তব্য রাখ।

২। বৃহত্তর ভারতে ভারতীয়দের কীর্তিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। "এই সকল দেশের......করিয়া ফেলিল"—কোন্ প্রবন্ধে এই উক্তিটি আছে? লেখক 'এই সকল দেশের' বলিতে কোন্ কোন্ দেশের কথা বলিয়াছেন? কিভাবে তাঁহারা নিজেদের দেশকে ভারতবর্ষের একটা অঙ্গস্বরূপ করিয়া ফেলিল?

৪। "ভারতীয় উপাখ্যান……হইতে হয়।"—উদ্ধৃতাংশটি কাহার লিখিত কোন্ প্রবন্ধের অন্তর্গত? কোন্ প্রসঙ্গে লেখক এই কথাগুলি অবতারণা করিয়াছেন? 'উপাখ্যান' বলিতে কি বুঝ? 'ভারতীয় উপাখ্যান কোন্‌গুলি?

৫। "ভারতবর্ষেও এত সুন্দর রামায়ণ ও কৃষ্ণকথার ছবি কোথাও চিত্রিত হয় নাই।"—বাক্যটি কোন্ প্রবন্ধ হইতে লওয়া হইয়াছে? 'রামায়ণ' ও 'কৃষ্ণকথা' এই দুইটির পরিচয় লিখ। ভারতবর্ষে না হইলে কোথায় চিত্রিত হইয়াছে?

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৬। কম্বোজের মন্দিরটি কি নামে বিখ্যাত? কম্বোজের বর্তমান নাম কী?

৭। যবদ্বীপের মন্দিরটি কী নামে খ্যাত? ইহা আসলে কী?

৮। যবদ্বীপের অন্তর্গত প্রাম্বানাণে কী কী মন্দির আছে?

৯। ভারতের মত কম্বোজে কোন্ কোন্ দেবতা পূজিত হইতেন?

১০। বরবুদুরের বারান্দা ও স্তূপগাত্রের চিত্রগুলি কী হইতে গৃহীত?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

১১। অর্থ লিখ এবং বাক্যে ব্যবহার কর:

সীমাবদ্ধ, কীর্তিকলাপ, মাতৃস্বরূপিণী, সমচতুষ্কোণ, বিদ্যমান, গম্ভীর ভাবোদ্দ্যোতক, অনুপম।

১২। এককথায় প্রকাশ কর:

মাতার স্বরূপ, একই রূপ, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, বিশেষভাবে খ্যাত, কতকগুলি ঘটনার সমাহার, অন্য রূপ, সংখ্যায় অনেক, লক্ষ্য করিবার মত।

১৩। সমাস লিখ:

মাতৃস্বরূপিণী, সমচতুষ্কোণ, রূপান্তর, অনুপম, নির্বাক, প্রস্তরস্তূপ,

১৪। প্রত্যয় নির্ধারণ কর:

সৃষ্টি, অবস্থিত, পূজিত, খোদিত, চিত্রিত, বিখ্যাত।

কঙ্কনবাবুদের বাড়ি, বড়বাবুর খাস কামরা।

[স্থূলকায় বড়বাবু—শিবনারায়ণবাবু তাকিয়ায় ঠেস দিয়া অর্ধশায়িত, মুখে গড়গড়ার নল। চাকর পায়ে হাত বুলাইতেছে। বয়স পঞ্চাশ বা তদূর্ধ্ব। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের মানুষ। পরনে চুনট করিয়া কোঁচানো থান-ধুতি। গায়ে বেনিয়ান। একখানা শাল শরীর হইতে খসিয়া আছে। সম্মুখে বিনীতভাবে আসিয়া দাঁড়াইল মামলা-সেরেস্তার কর্মচারী—গোপীনাথ। লোকটি বৈষ্ণব, কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠী, গায়ে ছিটের গলাবন্ধ কোট, পরনে আধময়লা থান ধুতি। কাঁধে জামার উপর একখানি চাদর সযত্নে ফেলা আছে। মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা। মধ্যস্থলে একটি টিকি। আসিয়া নতজানু হইয়া বসিয়া সবিনয়ে পায়ে হাত দিয়া মাথায় ঠেকাইল, জিভে ঠেকাইল, বুকে বুলাইল।]

শিব। অঃ, কে, গুপী ? এস। কী সংবাদ ?

গোপী। আজ্ঞে, সংবাদ গুরুতর।

শিব। গুরুতর ?

গোপী। আজ্ঞে, ছোট খোকাবাবু আজ মহাভারত মণ্ডলেরে একটা লাথি মেরেছিলেন।

শিব। হ্যাঁ হ্যাঁ। এক বেটা চাষা তখন এসেছিল বটে আমার কাছে।

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ। বিবেচনা করুন, লোকটা গেছে ফৌজদারিতে নালিশ করতে।

শিব। (চোখ বুজিয়া নল টানিতে টানিতে নিস্পৃহভাবেই বলিলেন) বল কী? লাথি মারার জন্যে বেটা চাষা নালিশ করতে গেছে!

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি ছিলাম কোর্টে—কমলপুরের স্বর্গীয় মহেশ্বর গাঙ্গুলীর বন্ধকী তমস্সুকের জন্যে তদীয় পুত্র হরিহর গাঙ্গুলী দিগরের নামে যে নালিশ দায়ের হয়েছে, তারই তদ্বিরের জন্যে।

শিব। (চাকরকে) জোরে!—জোরে! ওরে বেটা, আরও জোরে টেপ। আখ মাড়াই কলে যেমন আখ পেষে, তেমনই জোরে টেপ। পায়ের ওপর থাপ্পড় মারবি, ক্রোশখানেক তার শব্দ যাবে, তবে তো। হ্যাঁ, তারপর গুপী! বেটা চাষার নাম কী বললে হে?

গোপী। আজ্ঞে, মহাভারত মণ্ডল।

শিব। হ্যাঁ। বেটার বাপের নাম কী হে? রামায়ণ?

গোপী। আজ্ঞে না। চণ্ডী হ'ল ওর বাপের নাম। চণ্ডীচরণ মণ্ডল। পিতামহের নাম হরিশ মণ্ডল।

শিব। হরিশ মণ্ডল! হরিশ মণ্ডল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইবার বুঝেছি। হরিশ মণ্ডল। (এইবার চোখ খুলিয়া, তাকিয়াটা টানিয়া লইলেন) বাবার আমলে যে প্রজা-ধর্মঘট হয়, সে ধর্মঘটে হরিশ ছিল এক মাতব্বর।

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ। ১২৮৫ সালের ধর্মঘটে হরিশ মণ্ডল এক জন মাতব্বর ছিল। ডাঙাপাড়ার গৌরহরি ঘোষ, ধর্মরাজের দেবাংশী হরিবোলা পাল—

শিব। হরিশের নাতি মহাভারত। তখনই বাবা ও-পাপ সমূলে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন, আমি দয়া করেছিলাম। সমস্ত উচ্ছেদ ক'রেও সামান্য রেখে দিয়েছিলাম। সেই সামান্য আজ অষ্টাদশপর্ব মহাভারতে দাঁড়িয়েছে। আমাদের ছেলের নামে ফৌজদারিতে নালিশ করতে গেছে। চাপরাসী কে রয়েছে বাইরে?

(চাপরাসীর প্রবেশ)

চাপ। (সেলাম করিয়া) হুজুর!

শিব। মহাভারত মোড়ল, যাকে আজ ছোট খোকাবাবু লাথি মেরেছিল, তার দোরে গিয়ে হাজির থাক। বাড়িতে আসবামাত্র তাকে গলায় গামছা দিয়ে নিয়ে আসবি এখানে। এত বড় সাহস!

[চাপরাসী সেলাম করিয়া চলিয়া গেল]

গোপী। আজ্ঞে, যা বুঝলাম, সাহসের পিছনে লোক আছে।

শিব। লোক?

গোপী। আজ্ঞে, নুটু মুখুজ্জে।

শিব। (সোজা হইয়া বসিয়া) নুটু মুখুজ্জে! শিবপ্রসাদ ন্যায়রত্নের নাতি? কুনো কালীর বেটা? স্বদেশী ক'রে জেল খেটেছে, সেই ছোকরা?

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ। হরেন্দ্র মোক্তারের কাছে তার লেখা চিঠি আমি নিজে দেখেছি। বিনা পয়সায়, খরচা দিয়ে, মামলা দায়ের ক'রে দিতে অনুরোধ করেছিল নুটুবাবু। তা, আমি সঙ্গে সঙ্গে চোখ টিপে ইশারা ক'রে দিলাম। হরেনবাবুকে আমি মোক্তারনামাও দিয়ে এসেছি।

শিব। বেশ করেছ। তুমি চাপরাসীকে বারণ কর। বল মহাভারতকে আনবার দরকার নেই এখন।

[গোপীর ব্যস্ত হইয়া প্রস্থান]

নেপথ্যে দেবনারায়ণ। বাবা! বাবা রয়েছ?

[ব্যস্তভাবে প্রবেশ]

শিব। কী ব্যাপার? বড়বাবু, এত ব্যস্ত কেন?

দেব। ন্যায়রত্নের বাড়ির মেয়েরা খেতে আসেনি।

শিব। কার বাড়ির?

দেব। ন্যায়রত্নের, মানে নুটু মুখুজ্জের স্ত্রী আসেনি।

শিব। খেতে আসে নি?

দেব। না, নুটুর জ্ঞাতি-ভগ্নি সাতু ঠাকরুন বললে, গতবার নুটুর স্ত্রী দোতলায়—মানে আমাদের বাড়ি-ঘর; তা ছাড়া নবীন উকিলের বাড়ি—এইসব সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের সঙ্গে সে বসেছিল। তাতে সাধারণের আপত্তি হতে পারে ব'লে তাকে নীচে বসতে পাঠান হয়েছিল। সেইজন্য আসে নি।

শিবু। হুঁ।

দেব। কর্তব্যের খাতিরে একজন কর্মচারীকে পাঠিয়ে দিই। তাতে আসে ভাল, না আসে—

শিব। আসবে না।

দেব। না আসে, তার ব্যবস্থা হবে। আর আসবে না কী ক'রে বলছ?

শিব। নুটুকে তোমরা চেন না। সে আরও কী করেছে জান? ছোট খোকা আজ হরিশ মোড়লের নাতিকে একটা লাথি মেরেছে—

দেব। জানি।

শিব। নুটু তাকে উত্তেজিত ক'রে ফৌজদারিতে নালিশ করতে পাঠিয়েছে।

দেব। কী বলছ তুমি বাবা?

শিব। গুপী এখুনি মহকুমা থেকে ফিরে এল, সে-ই খবর নিয়ে এসেছে। কি, বিশ্বাস করতে পারছ না?

দেব। অবিশ্যি লোকে ওদের বংশটাকেই বলে—বিছুটির ঝাড়। তবু ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। আমাদের পেছনে লাগবে, ওর এত সাহস হবে? আর নুটু তো লোক খারাপ নয়।

শিব। ওর পিতামহ শিবপ্রসাদ ন্যায়রত্ন আমাকে সভার মধ্যে কী বলেছিল জান? আমার পিতামহের শ্রাদ্ধের বিচার-সভায় আমি গীতার "যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানি" শ্লোকটি আউড়েছিলাম। আমায় সেই সভার মধ্যেই বলেছিল—জিহ্বার জড়তা দূর হয় নি তোমার; দেবভাষার অপমান করা হয় ওরকম উচ্চারণে—যদার য বর্গীয় জনয়, অন্তস্থ য। সে উচ্চারণ আজও করতে পারি না। ও-বংশের সন্তানের পক্ষে সবই সম্ভব।

দেব। তা হ'লে?

শিব। তা হ'লে আমাদের নিজেদের কাউকে যেতে হবে। সামাজিকতাটা অন্তত লোকধর্মের খাতিরেও রাখতে হবে। যাও, ডেকে আন—দামী আসন পেতে, রূপোর থালায় খেতে দাও নুটুর স্ত্রীকে। অপমান করতে হয় সম্মানের খোলস পরিয়ে কর। যেখানে চামড়ার জুতো না চলে, সেখানে চাঁদির জুতো চালাতে হয়।

দেব। বেশ, তাহ'লে সেই ব্যবস্থাই করি।

শিব। মোক্তারিতে পসার হ'ল না ব'লে ছোকরা যখন চাষা-ভূষার ছেলেদের জন্য পাঠশালা খুলে বসল, তখন আমি হাজার বার বলেছিলাম—উঠিয়ে দাও, ওটা উঠিয়ে দাও। তখন তুমিই বলেছিলে, একটু-আধটু লেখাপড়া বই তো নয়। ওরে বাবা সৎমাকে ঘরে ঢুকতে দিলে নিজের মা কখনও স্থির থাকতে পারে না। কঙ্কনায় মা লক্ষ্মী বাঁধা আছেন, সেখানে সরস্বতীর আসন? নইলে কি কঙ্কনার বাবুরা একটা ইস্কুল দিতে পারতেন না, (হা-হা করিয়া হাসিয়া) খোদ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকেই এবার সে কথা বলে দিলাম—

হুজুর যখন ধরেছেন, তখন হাসপাতাল দোব আমরা, ইস্কুলের কথা বলবেন না।

দেব। দেরি হয়ে যাচ্ছে, তা হ'লে আমি যাই।

শিব। যাও। কিন্তু ভুলে যেও না বাবা, নুটু মুখুজ্জের নটে-গাছটি মুড়োতে হবে, আর মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের শেষ পর্বটি পর্যন্ত আখের কলে মাড়াই ক'রে ছিবড়ে ক'রে ফেলে দিতে হবে।

[দেবনারায়ণের প্রস্থান]

(চাকরকে) আঃ। শরীর ম্যাজ ম্যাজ ক'রে উঠল যে। জোরে জোরে—বেশ গোটাকতক কিল মার্ তো দেখি। (নপথ্যে ঘড়িতে তিনটা বাজল) (সচকিত ভাবে) হরি, হরি, হরি। তাই তো বলি, শরীর এমন করে কেন? তিনটে বেজে গেল। আফিং রে বেটা, আফিং। [দুই পুরুষ-নাটক হইতে উদ্ধৃত

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। কঙ্কনার বড়বাবুর বেশভূষা ও তাঁহার মামলা-সেরেস্তার কর্মচারী গোপীনাথের বেশভূষা নিজ ভাষায় বর্ণনা কর।

২। নাট্যাংশটি পাঠ করিয়া তৎকালীন জমিদার ও সাধারণ মানুষের সমাজের চিত্রটি পরিস্ফুট কর।

৩। অল্প কথায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের চরিত্র চিত্রণ কর।

(ঊর্ধ্বপক্ষে পাঁচটি বাক্যে)

গোপীনাথ, বড়বাবু শিবনারায়ণ, নুটু মুখার্জীর স্ত্রী ও নুটু মুখার্জী, মহাভারত মণ্ডল।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

৪। "ওরে বাবা·········পারেন না।"—একথা কোন্ গদ্যাংশে আছে? ইহার লেখক কে? কথাগুলি কে কাহাকে কোন্ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন?

৫। "ন্টু মুখুজ্জের নটে-গাছটি মুড়োতে হবে······ফেলে দিতে হবে।" —উক্তিটি কাহার? কাহাকে তিনি এই কথাগুলি বলিয়াছেন? 'নটে-গাছটি মুড়ানো' কোন্ অর্থে বলা হইয়াছে? মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের নাম লিখ।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৬। গোপীনাথ মহাভারতের পরিচয় কি বলিয়া দিয়াছিল?

৭। শিবনারায়ণবাবু ন্টু মুখার্জীর পরিচয় কি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন?

৮। "অপমান করতে হয় সম্মানের খোলস পরিয়ে কর"—এ কথার সঙ্গে তুমি একমত? কারণ দেখাও।

৯। "আমি মোক্তারনামাও দিয়ে এসেছি"—'মোক্তারনামা' বলিতে কী বুঝ? কে কাহাকে মোক্তারনামা দিয়া আসিয়াছিল?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

১০। কোন ভাষা হইতে বাংলা ভাষায় নিম্নলিখিত শব্দগুলি আসিয়াছে লিখ: খাসকামরা, গড়গড়া, মামলা, সেরেস্তা, মোক্তারনামা, ফৌজদারি, নালিশ, চাপরাসী, সেলাম।

১১। বানানগুলি শুদ্ধ করিয়া লিখ:
লক্ষী, স্বরসতী, ন্যায়রত্ন, বৈষ্ণব, শমূলে, অস্টাদসপর্ব, অর্ধনায়িত।

১২। নিম্নের বাক্যাংশগুলি সহযোগে এক-একটি সার্থক বাক্য রচনা কর:
নালিশ দায়ের, সমূলে উচ্ছেদ, অষ্টাদশপর্ব মহাভারত, গলায় গামছা দিয়ে, বিছুটির ঝাড়, চাঁদির জুতো।

সকালবেলা আহমদ আলী স্বয়ং আমাকে একখানা বাসে ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে তাঁকে আমার জান-মান বাঁচাবার জন্য বিস্তর দিব্যদিলাশা দিয়ে বিদায় দিলেন।

বাসের গেটে একপাল কাবুলী ব্যবসায়ী। পেশাওয়ার থেকে সিগারেট, গ্রামোফোন রেকর্ড, পেলেট, বাসন, ঝাড়লণ্ঠন, ফুটবল, বিজলী বাতির সাজসরঞ্জাম, কেতাবপুঁথি এক কথায় দুনিয়ার সব জিনিস কিনে নিয়ে যাচ্ছে। আফগান শিল্প প্রস্তুত করে মাত্র তিন বস্তু—বন্দুক, গোলাগুলি আর শীতের কাপড়। বাদবাকি প্রায় সব কিছুই আমদানি করতে হয় হিন্দুস্থান থেকে, কিছুটা রুশ থেকে।

আগের দিন পেশাওয়ারে ১১৪ ডিগ্রী গরম পড়েছিল—ছায়াতে। এখন বাস যাচ্ছে যেখান দিয়ে সেখান থেকে দূরবীণ দিয়ে তাকালেও একটা পাতা পর্যন্ত চোখে পড়ে না। থাকার মধ্যে আছে এখানে ওখানে পাথরের গায়ে হলদে ঘাসের পোঁচ।

এরকম ঝলসে-যাওয়া দেশ আর দেখিনি—মরুভূমির কথা আলাদা। সেখানে যা কিছু পোড়বার মত, সে সব আমাদের জন্মের বহু পূর্বে

পুড়ে গিয়ে ছাই হয়ে উড়ে চলে গিয়েছে মরুভূমি ছেড়ে—সার হয়ে নূতন ঘাস পাতা জন্মাবার চেষ্টা আর করেনি।

পেশাওয়ার থেকে জমরুদ দুর্গ সাড়ে দশ মাইল সমতল ভূমি। সেখানে একদফা পাসপোর্ট দেখাতে হল। তারপর খাইবার গিরিসংকট।

দুদিকে হাজার ফুট উঁচু পাথরের নেড়া পাহাড়। মাঝখানে খাইবার পাস। এক জোড়া রাস্তা এঁকে বেঁকে একে অন্যের গা ঘেঁসে চলেছে কাবুলের দিকে। এক রাস্তা মোটরের জন্য। অন্য রাস্তা উট-খচ্চর গাধা-ঘোড়ার পণ্যবাহিনী বা ক্যারাভানের জন্য। সঙ্কীর্ণতম দুই রাস্তায় মিলে ত্রিশ হাতও হবে না। সে রাস্তা আবার মাতালের মত টলতে টলতে এতই এঁকে বেঁকে গিয়েছে যে, যে কোন জায়গায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে ডাইনে বাঁয়ে পাহাড়, সামনে পিছনে পাহাড়।

দ্বি-প্রহরে সূর্য সেই নরক-কুণ্ডে সোজা নেমে এসেছে—তাই নিয়ে চতুর্দিকের পাহাড় যেন লোফালুফি খেলছে। এই গিরিসংকটে আফগানের লক্ষ কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়ে কোটি কণ্ঠে পরিবর্তিত হয়—এই গিরিসঙ্কটে এক মার্তণ্ড ক্ষণে ক্ষণে লক্ষ মার্তণ্ডে পরিণত হয়। তাদের কোটি কোটি অগ্নিজিহ্বা আমাদের সর্বাঙ্গ লেহন করে পরিতুষ্ট হন না, চক্ষুর চর্ম পর্যন্ত অগ্নিশলাকা দিয়ে বিদ্ধ করে যাচ্ছেন।

অবাক হয়ে দেখছি সেই গরমে বুখারার পুস্তিন (ফার) নিয়ে ব্যবসায়ীরা দুই ইঞ্চি পুরু লোমওয়ালা চামড়ার ওভারকোট গায়ে খচ্চর খেদিয়ে খেদিয়ে ভারতবর্ষের দিকে চলেছে।

কত দেশের কত রকমের লোক পণ্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। কত রঙের টুপি, কত রঙের পাগড়ি, কত যুগের অস্ত্র—গাদা বন্দুক থেকে আরম্ভ করে আধুনিকতম জার্মান মাউজার—দমস্কের বিখ্যাত

সুদর্শন তরবারি। কারো হাতে পেতলে-বাঁধানো লাঠি, কারো হাতে লম্বা ঝক্‌ঝকে বর্শা—উটের পিঠে পশমে রেশমে বোনা কত রঙের কার্পেট কত আকারের সমোভার। বস্তা বস্তা পেস্তা, বাদাম, আখরোট, কিসমিস চলেছে হিন্দুস্থানের বিরিয়ানি, পোলাওয়ের জৌলুষ বাড়াবার জন্য।

সাবাই চলেছে অতি ধীরে অতি মন্থরে···ধড়াম করে শব্দ হল। আমি সর্দারজীর দিকে তাকালুম। তিনি দেখি অতি শান্তভাবে গাড়িখানা একপাশে নিয়ে দাঁড় করালেন। বললেন, "টায়ার ফেঁসেছে। প্রতিবারেই হয়। এই গরমে না হওয়াই বিচিত্র।"

সর্দারজী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, "খাইবার পাসের রাস্তা ছুটো সরকারের বটে, কিন্তু ছুদিকের জমি পাঠানের। সেখানে নেমেছ কি মরেছ। আড়ালে আবডালে পাঠান সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে আছে। নামলেই—"

মোটর মেরামত করতে কতক্ষণ লেগেছিল মনে নেই। শুনেছি ভয়ংকর জ্বর হলে রোগীর সময়ের আন্দাজ একেবারে চলে যায়। পরের দিন যখন সর্দারজীকে জিজ্ঞাসা করলুম চাকা বদলাতে ছুঘণ্টা সময় লাগল কি করে, তখন সর্দারজী বলেছিলেন, "সময় লেগেছিল নাকি মাত্র আধ ঘণ্টা।"

মোটর আবার চলল। হঠাৎ দেখি সামনে একি! মরীচিকা? সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে গেট কেন? মোটর থামল। পাসপোর্ট দেখাতে হল। গেট খুলে গেল। আফগানিস্তানে ঢুকলুম।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। লেখক যে বাসে চড়ে বসলেন সে বাসে কাবুলী ব্যবসায়ীরা পেশাওয়ার থেকে কী কী জিনিস কিনে নিয়ে যাচ্ছিল?

২। লেখক পেশোয়ার থেকে আফগানিস্তানে যেতে যেতে পথের যে দৃশ্য বর্ণনা করেছেন তা তোমার নিজ ভাষায় বর্ণনা কর।

৩। "সবাই চলেছে অতি ধীরে অতি মন্থরে"—কারা কোথায় যাচ্ছে? তাদের সঙ্গে কী কী পণ্য রয়েছে? তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ কেমন?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

৪। "যেখানে যা কিছু......চেষ্টা আর করেনি।"—উদ্ধৃতাংশটি কার লেখা, কোন প্রবন্ধের অন্তর্গত? কোন প্রসঙ্গে লেখক একথাগুলি বলেছেন? কথাগুলির অর্থ নিজের ভাষায় বুঝিয়ে লেখ।

৫। "দ্বি-প্রহরে সূর্য...লোফালুফি খেলছে।"—কথাগুলি কে কোন প্রসঙ্গে বলেছেন? কথাগুলির অর্থ তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৬। "আফগান শিল্প প্রস্তুত করে মাত্র তিন বস্তু"—কী কী? বাদবাকি আর সব কিছু কোথা থেকে আমদানি করতে হয়?

৭। দ্বি-প্রহরে খাইবার গিরিসংকট-এ সূর্যকিরণকে লেখক কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন? এই গিরিসংকট দিয়ে চলতে চলতে লেখক পুরানো দিনের কোন কথা স্মরণ করেছেন?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

৮। বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :

আমদানি, সমতল, সুদর্শন, মন্থর, বন্ধ।

৯। অর্থ লেখ এবং পদ নির্ণয় কর :

প্রতিধ্বনিত, পরিবর্তিত, পরিতুষ্ট, সুদর্শন, জৌলুষ, মরীচিকা, বিরিয়ানি, পোলাও, সামোভার।

———

"আমাকে বিদ্যাসাগরের কাছে নিয়ে যাবে?" মাষ্টারমশায়কে জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুর। "আমার দেখতে বড় সাধ হয়।"

বিদ্যাসাগরের ইস্কুলে মাষ্টারি করেন, একদিন কথাটা পাড়লেন গিয়ে মাষ্টারমশাই। বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমনতরো পরমহংস হে? গেরুয়া কাপড় পরে থাকেন নাকি?"

"না, লালপাড়ে কাপড় পরেন। গায়ে জামা, পায়ে বার্ণিশ-করা চটি-জুতো। রাসমণির বাড়িতে থাকেন একটি ঘরে, তক্তাপোশের উপর সামান্য বিছানা। তাতেই শোন, মশারি খাটান। দেখতে অত্যন্ত সাদাসিধে, কিন্তু এমন আশ্চর্য লোক আর দেখা যায় না। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু জানেন না সংসারে।"

"বটে?" খুশী হয়ে থাকলেন বিদ্যাসাগর। বললেন, শনিবার চারটের সময় নিয়ে এসো।"

গাড়ি করে যাচ্ছেন রামকৃষ্ণ। সঙ্গে মাষ্টার, ভবনাথ হাজরা পোল পার হয়ে শ্যামবাজার হয়ে আমহার্স্ট স্ট্রীটে পড়েছে গাড়ি।

"এই দাতুড়বাগানের কাছে এসে গেলাম—"

মুহূর্তে ভাবাবেশ হল রামকৃষ্ণের।

"এই রামমোহন রায়ের বাগান-বাড়ি।"

রামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে বললেন, "এখন ওসব আর ভাল লাগছে না।"

এখন শুধু বিদ্যাসাগর। বিদ্যা—যা থেকে ভক্তি, দয়া, প্রেম, জ্ঞান—যা শুধু ঈশ্বরের পথে নিয়ে যায়। সেই বিদ্যার সমুদ্র।

দোতলা ইংরেজ-পছন্দ বাড়ী। চারিদিকে দেওয়াল, পশ্চিমধারে ফটক। পাঁচিল থেকে নীচের ঘর পর্যন্ত ফুলের কেয়ারী। বিদ্যাসাগর উপরে থাকেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই উত্তরে একটি কামরা, তার পূর্বে হল ঘর। হল ঘরের প্রান্তে টেবিল চেয়ার। সেইখানে পশ্চিমমুখো হয়ে বসে কাজ করেন বিদ্যাসাগর। হল-ঘরের দক্ষিণে বিদ্যাসাগরের লাইব্রেরী। পাশেই শোবার ঘর।

"মা গো, পণ্ডিতের সাথে দেখা করতে চলেছি, আমার মুখ রাখিস মা।"

গাড়ি থেকে নামলেন রামকৃষ্ণ। গায়ে একটি লংক্লথের জামা, পরনে লালপেড়ে ধুতি, আঁচলটি কাঁধের উপরে ফেলা। পায়ে বার্ণিশ-করা চটিজুতো। উঠান পেরিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন মাষ্টারকে, "জামার বোতাম খোলা রয়েছে, এতে কিছু দোষ হবে না।"

"আপনার কিছুতেই দোষ হবে না।" বললেন মাষ্টার। "আপনার বোতাম দেবার দরকার নেই।"

নিশ্চিন্ত হলেন ঠাকুর। বালককে বোঝালে যেমন নিশ্চিন্ত হয় তেমনি।

হল-ঘরে না বসে উত্তরের কামরায় বসেছেন বিদ্যাসাগর। বয়স আন্দাজ বাষট্টি। রামকৃষ্ণের থেকে ষোল সতের বছরের বড়। খর্বাকৃতি, মাথাটি প্রকাণ্ড, চারপাশ উড়িয়াদের মতো কামানো। পরনে সাদা থান-কাপড়, গায়ে হাত কাটা ফ্লানেলের জামা, গলার পৈতা দেখা যাচ্ছে, পায়ে ঠনঠনের চটিজুতো। বাঁধানো দাঁতগুলো ঝক্‌ঝক্ করছে।

রামকৃষ্ণ ঘরে ঢুকতেই বিদ্যাসাগর উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন। যে টেবিল সামনে রেখে দাক্ষিণাস্য হয়ে বসেছিলেন বিদ্যাসাগর, তার পূর্ব পাশে এসে দাঁড়ালেন রামকৃষ্ণ। বাঁ হাতখানি টেবিলের উপর। যেন সংলগ্ন হয়ে আছেন। বিদ্যাসাগর। একদৃষ্টে তাঁকে দেখছেন আর হাসছেন ভাবাবেশে। ভাবাবেশ সংবরণ করার জন্য মাঝে মাঝে বলছেন রামকৃষ্ণ, "জল খাব।" "জল খাব।"

দেখতে দেখতে ভিড় হয়ে গেল ঘরের মধ্যে। পিছনে একটা পিঠতোলা বেঞ্চি ছিল, তাতে বসলেন রামকৃষ্ণ। জল এসে গেল ভিতর থেকে। বিদ্যাসাগর মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু খাবার দিলে ইনি খাবেন কি ?"

"আজ্ঞে আনুন না।" বললেন মাষ্টার।

বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেলেন বাড়ির মধ্যে। একথালা মিষ্টি নিয়ে এলেন। বললেন, "এগুলি বর্ধমান থেকে এসেছে।"

মিষ্টিমুখ করলেন রামকৃষ্ণ। ভবনাথ হাজরাও কিছু অংশ পেল। মাষ্টারের বেলায় বিদ্যাসাগর বললেন, "ও তো ঘরের ছেলে। ওর জন্যে আটকাবে না।"

মিষ্টিমুখের পর বিদ্যাসাগরের দিকে চেয়ে মিষ্টি হেসে বললেন রামকৃষ্ণ, আজ সাগরে এসে মিল্লাম। এতদিন খাল বিল হ্রদ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখলাম।"

বিদ্যাসাগর হেসে জবাব দিলেন, "তবে লোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।"

"না গো ! লোনা জল কেন ? তুমি অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি যে ক্ষীরসমুদ্র।

এক ঘর লোক। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে। কথার রস গ্রহণ করে হাসছে সবাই। কিন্তু বিদ্যাসাগর চুপ।

"তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম।" বললেন রামকৃষ্ণ। "সত্ত্বগুণ দয়া থেকে। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্য দয়া রেখেছিলেন। তোমার বিদ্যাদান অন্নদান—সে-ও ঐ দয়া থেকে। কেউ করে নামের জন্যে, পুণ্যের জন্যে, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর তোমার হচ্ছে দয়ার থেকে, দয়ার জন্যে। তাই তুমি তো সিদ্ধ গো।"

"আমি সিদ্ধ?" চমকে উঠলেন বিদ্যাসাগর। "আমি আবার ভগবানের জন্যে সাধনা করলাম কবে?

রামকৃষ্ণ হাসলেন। বললেন, "আলু পটল সিদ্ধ হলে কী হয়? নরম হয়। তুমিও তো তেমনি নরম দেহ হয়ে গেছ। পরের দুঃখে তোমার হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছে। তোমার এত দয়া, তুমি নও তো আর কে সিদ্ধ?"

যে মাতৃভক্ত সে কি সাধক নয়! মা বলেছেন, ভাইয়ের বিয়েতে হাজির হতে—যেমন করেই হোক, দামোদর সাঁতরেই চলে গেলেন। তারপর মা যখন মারা গেলেন, বাড়িঘর ছেড়ে চলে গেলেন নির্জনে। আর কিছুর জন্যে নয়, মার জন্যে কাঁদতে বুক ভরে।

পরের জন্যে যে কাঁদে সে পরমের জন্যই কাঁদে।

বিদ্যাসাগর বললেন রামকৃষ্ণকে, "কিন্তু জানেন তো কলাইবাটা সিদ্ধ হলে শক্ত হয়ে যায়।"

"তুমি তেমনি পণ্ডিত নও গো। তুমি দরকচা-পড়া পণ্ডিত নও। শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, কিন্তু তার নজর ভাগাড়ের দিকে। তুমি সে রকম নও। বিদ্যার ঐশ্বর্য—দয়া ভক্তি বৈরাগ্য খুঁজছে। তুমি সিদ্ধ নও তো কে সিদ্ধ?"

এক জ্ঞানময় পুরুষ দেখছেন এক আনন্দময় পুরুষকে।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। রামকৃষ্ণ কিরূপ বেশে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন ?

২। প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের আকৃতি ও বেশভূষার যে পরিচয় পাও তা বিবৃত কর।

৩। রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখে 'সিদ্ধ পুরুষ' বললে বিদ্যাসাগর কি বলেছিলেন ? প্রত্যুত্তরে রামকৃষ্ণই বা কি বলেছিলেন ?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

৪। "শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্যে দয়া রেখেছিলেন"—একথা কে কোন্ প্রসঙ্গে বলেছিলেন ? 'শুকদেব'-এর পরিচয় দাও। 'লোকশিক্ষা' বলিতে কি বোঝ ?

৫। "এক জ্ঞানময় পুরুষ দেখছেন এক আনন্দময় পুরুষকে"—আলোচ্য অংশটি কার লেখা কোন্ প্রবন্ধ থেকে গৃহীত হয়েছে ? 'জ্ঞানময়' ও 'আনন্দময়' পুরুষ কে কে ? কেন তাঁদের এরূপ বলা হয়েছে ?

৬। "পরের জন্যে যে কাঁদে সে তো পরমের জন্যেই কাঁদে"—প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৭। লেখক 'বিদ্যাসাগর' কথাটিকে 'বিদ্যা' ও 'সাগর' এই দু' অংশে ভেঙ্গে ঐ দু'-অংশের যে অঙ্কন করেছেন তা অবিকল উদ্ধৃত কর।

৮। "তবে লোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।"—বক্তা কে ? 'লোনা জল' কথার তাৎপর্য কি ?

৯। "কলাইবাটা সিদ্ধ হলে শক্ত হয়ে যায়।"—কিসের সঙ্গে একথার তুলনা করা হয়েছে ?

১০। 'সত্ত্বগুণ দয়া থেকে'—গুণ ক'রকম ও কি কি ? সত্ত্বগুণ সম্পন্ন মানব সাধারণতঃ কিরূপ চরিত্রের হন ?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

১১। দয়া, পুণ্য, সিদ্ধ, পণ্ডিত, খর্বাকৃতি—কথাগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লেখ।

১২। শূন্যস্থানে পাঠ্যাংশের কথা বসাও ঃ

(ক) মা গো, — সঙ্গে দেখা করতে চলেছি আমার — রাখিস মা।

(খ) তুমি তো — সাগর নও, তুমি যে — সাগর। তুমি যে —।

(গ) পরের জন্যে যে — সে তো — জন্যেই কাঁদে।

১৩। সমাস নির্ণয় কর।

বিদ্যাসাগর, ভাবাবেশ, অবিদ্যা, ক্ষীরসমুদ্র, পরমহংস, অন্নদান, আনন্দময়।

———

—"বন্দেমাতরম্"—

—"মহাত্মা গান্ধীকি জয়"—

উত্তরাপথের গিরিদুর্গ আর দক্ষিণের নীলসমুদ্র উন্মথিত ক'রে উচ্চারিত হল সঙ্কল্প বাক্য ঃ

"আজ আমরা সঙ্কল্প লইতেছি, ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত আমরা নিরস্ত হইব না। কিন্তু স্বাধীনতা আনিতে হইবে সত্যাগ্রহের ভিতর দিয়া, পরিপূর্ণ অহিংসার সহায়তায়। আমরা বিদেশী দ্রব্য বয়কট করিব, আত্মঘাতী মাদকদ্রব্য বর্জন করিব, অন্যায় লবণকরকে অস্বীকার করিয়া স্বহস্তে লবণ তৈরী করিব—"

মহাত্মা গান্ধী! দিকে দিকে রুদ্রধ্বনিতে বাজিতে লাগিল ওই একটি নাম। যাত্রা করলেন বে-আইনী লবণ সত্যাগ্রহের নির্ভীক অভিযানে। সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ স্পর্ধার উত্তরে শান্তকণ্ঠে তিনি জবাব দিলেন ঃ মেরা এক কদমসে সারে হিন্দোস্তান উথাল-পাথাল হো যায়গা—"

ওই একটি কথার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চক্ষের পলকে ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে—দাবানল জ্বলল পাঞ্জাব-সিন্ধু থেকে উৎকল-বঙ্গ পর্যন্ত, আগুন ধরল ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের বুকের পাঁজরে। হিন্দুস্থান উথাল-পাথাল হয়ে উঠলো।

উনিশ শো তিরিশ সাল।

সেদিন কি ভুলবার দিন! ঘরে ঘরে উড়তে লাগল ত্রিবর্ণ পতাকা, পড়শীর ঘর ঘর মুখর হয়ে উঠলো চরকার ঘর্ঘরে, হাতে হাতে ঘুরতে লাগল তক্‌লি। স্বাবলম্বী হও—নিজের হাতে মিটিয়ে নাও নিজের প্রয়োজন, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় দেবতার প্রসাদী ফুলের মতো হাসিমুখে তুলে নাও। কণ্ঠ রোধ করে দাও লাঙ্কাশায়ার আর ম্যাঞ্চেস্টারের, অবসান ঘটিয়ে দাও শৌখিন বিলাতি পরমুখাপেক্ষিতার। অপমানে লজ্জায় জর্জরিত পরের সজ্জা দূর ক'রে দিয়ে দেশ-মাতার দেওয়া উত্তরীয় প'রে শুচি হও, কৃতার্থ হয়ে ওঠ।

রাস্তার মোড়ে বিলাতী কাপড়ের স্তূপ পুড়ছে। সিগারেটের প্যাকেট পর্বতের আকারে জড় করে তাতে আগুন ধরানো হয়েছে; দেশী বিলাতী মদের বোতল চুরমার হয়ে গড়াচ্ছে রাস্তায়।

কী আশ্চর্য দিন—কী অপূর্ব সেদিনকার উন্মাদনা!

ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এলো ইস্কুল-কলেজ থেকে, উকিল-মোক্তারেরা বেরিয়ে এলেন আদালতের মোহ কাটিয়ে। ভয় নেই, দ্বিধা নেই, সংশয় নেই। স্বাধীনতা-হীনতায় কেউ বেঁচে থাকতে চায় না। এখন উর্দ্ধ গগনে মাদল বেজেছে, নীচে ডাক দিয়েছে উতলা ধরণী, অরুণ প্রাতের তরুণদলকে আর অপেক্ষা করলে চলবে না, বেরিয়ে পড়তে হবে। ডাক দিয়ে বলতে হবে, "ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা—"

সমস্ত দেশ, সমস্ত মানুষকে সেদিন পাগল ক'রে দিয়েছিল নবজীনের উন্মাদ-ছন্দ। কোন নির্লজ্জ ধূমপায়ী এক মুসলমান বিড়ি-

ওয়ালার কাছে 'কাঁচি-মার্কা' সিগারেট চেয়েছিল, তেড়ে উত্তর এল: "জুতি-মার্কা হ্যায় খাওগে?" একখানা বিলাতী কাপড়ের ওপর খদ্দরের পাঞ্জাবি চড়িয়ে কে যেন নাপিতের কাছে দাড়ি কামাতে গিয়েছিল। নাপিত তার আধখানা গাল কামিয়ে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদেয় ক'রে দিল। স্টেশনের সামান্য কুলী পর্যন্ত সাদা সাহেবের মাল তুলতে ঘৃণা বোধ করলে, "নেই ছুঁয়েঙ্গে।"

সেদিন কেউ ঘরে থাকতে পারে নি।

উনিশ শো তিরিশ সালের স্পর্শমণির ছোঁয়া লেগে সোনা হয়ে গেছে অনেক আবর্জনা, মুছে গেছে অনেক গ্লানি, ধুয়ে নির্মল হয়ে গেছে যুগসঞ্চিত অনেক অপরাধের অপবাদ। রেল স্টেশনের কুলী থেকে মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙড় পর্যন্ত কেউ বাদ নেই। আর 'বন্দেমাতরম্'-এর বীজমন্ত্র মুখের থেকে বুকে গিয়ে জমাট বেঁধেছে। গলা টিপে মুখকে তুমি বন্ধ করতে পার, কিন্তু বুকের এই সমস্ত রক্তাক্ত মর্মলিপিকে মুছবে কে?

চারিদিকের-রৌদ্র, গাছপালা, পথ, বাড়ি-ঘর কোন কিছুর আজ যেন আলাদা কোন রূপ নেই; স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই কোন রকমের; আজ সমস্ত কিছু এক রকম হয়ে গেছে—ধরেছে একটি রঙ্—ত্রিবর্ণ পতাকার রঙ্। আজ আকাশে বাতাসে ঝিম্ ঝিম্ রিম্ রিম্ ক'রে একটা সুরের রেশ নিয়তই ঝঙ্কৃত হচ্ছে: 'বন্দেমাতরম্' বন্দেমাতরম্'।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। "উত্তরাপথের গিরিদুর্গ আর দক্ষিণের নীলসমুদ্র উন্মথিত ক'রে উচ্চারিত হল সংকল্প বাক্য।"—সংকল্প বাক্যগুলি হুবহু উদ্ধৃত কর।

২। উনিশ শো তিরিশ সালের উন্মাদনার কারণ কি? এই উন্মাদনার

সময় মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা উল্লেখ কর। তাঁর নেতৃত্বে কিভাবে জাতি আন্দোলন করেছিল তা সবিস্তারে লেখ।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

৩। "ওই একটি কথার…উথাল পাথাল হয়ে উঠল।"—এ অংশটি কার লেখা কোন্ কাহিনী থেকে নেওয়া হয়েছে? প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কিভাবে হিন্দুস্থান উথাল-পাথাল হয়ে উঠল লেখ।

৪। "বন্দেমাতরম"-এর বীজমন্ত্র বুঝবে কে?"—প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কথাগুলির যথার্থ অর্থ লিখ। 'বন্দেমাতরম্' শব্দটির টিকা শেষে সংযোজন কর।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৫। 'উত্তরাপথের গিরিদুর্গ'—কাকে উদ্দেশ করা হয়েছে?

৬। 'দক্ষিণের নীলসমুদ্র'—কী কী?

৭। 'বে-আইনী লবণ সত্যাগ্রহ'—এটি কখন ঘটে? এই সত্যাগ্রহের হোতা কে ছিলেন?

৮। 'সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ স্পর্ধার উত্তরে'—কে কি উত্তর দিয়েছিলেন? 'সাম্রাজ্যবাদ' কাদের উদ্দেশ করে বলা হয়েছে?

৯। 'কণ্ঠরোধ করে দাও লাঙ্কাশায়ার আর ম্যাঞ্চেস্টারের'—কিভাবে কণ্ঠরোধ করতে বলা হয়েছে? যে-কোন একটি স্থানের টীকা লেখ।

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

১০। পদ পরিবর্তন কর:
উচ্চারিত, বর্জন, নির্ভীক, মুখর, পরমুখাপেক্ষিতা, রক্তাক্ত।

১১। ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ:
রুদ্রধ্বনিতে, সত্যাগ্রহ, ত্রিবর্ণ, কণ্ঠরোধ, আত্মঘাতী।

চন্দ্রাভিযান

বিশু মুখোপাধ্যায়

আদিম যুগ থেকে মানুষ অজানার সন্ধানে জয়যাত্রা করেছে। অজানাকে জানার বাসনা তার চিরদিনের। মানুষের এই জয়যাত্রা সামনের দিকে এগিয়ে চলার, পিছনে ফেরবার তার অবকাশ নেই।

অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা, অজেয়কে জয় করার প্রচেষ্টা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। কোন অনাদি কাল থেকে এই প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই মানুষ নিত্য নব নব আবিষ্কারের পথে এগিয়ে গেছে, অভিযান করেছে সমুদ্রের অতল গহ্বরে, পর্বতের অত্যুঙ্গ চুড়ায়, হিংস্র জীবজন্তু সমাকীর্ণ গহন অরণ্যে।

এর জন্যে রয়েছে মানুষের দুষ্কর সাধনা, অমূল্য প্রাণদান, দীর্ঘকালের শ্রম, অসাধারণ ধৈর্য ও অধ্যবসায়। পরাজয়ের নিষ্ফলতায় আশাহীন না হয়ে, সকল বাধাবিঘ্নকে অগ্রাহ্য করে, মানুষ কত কিছুই যে আবিষ্কার করেছে তার ইয়ত্তা নেই! এই জয়ের উন্মাদনায় মানুষ চাঁদকে পুরেছে আজ হাতের মুঠোয়। এবার যাবে সে গ্রহান্তরে। তারই প্রস্তুতি চলেছে ঘরে-বাইরে।

আজ আমরা এখানে চন্দ্রাভিযানের কিছু কথা সংক্ষেপে বলব।

মহাকাশে চাঁদ হ'ল আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ; পৃথিবীর উপগ্রহ। পৃথিবীর থেকে এর দূরত্ব হল ২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল ; অর্থাৎ প্রায় ৩,৮৪,৮০০ কিলোমিটার। চাঁদে বাতাস নেই, জল নেই, প্রাণ নেই। নেই কোন সাড়া-শব্দ—নীরব নিথর নিষ্প্রাণ চাঁদ অনন্তকাল ধরে, অনন্ত বিস্ময়ের জাল সৃষ্টি করে রয়েছে নীল আকাশের বুকে—ঘুরে চলেছে পৃথিবীর চারিদিকে, পশ্চিম থেকে পুবে একই ভাবে !

চাঁদে কোন বায়ু না থাকার জন্যে, সেখানে যে-কোন জিনিসের ওজন পৃথিবীর ওজনের এক-ষষ্ঠাংশ ভাগ মাত্র। সেখানে মানুষ স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারে না—লাফিয়ে লাফিয়ে খরগোশের মত চলতে হয় ঐ বায়ু না থাকার জন্যেই।

এই চাঁদে যাবার সাধ ছিল মানুষের বহুদিনের। সেই দীর্ঘকালের সাধ মানুষের পূর্ণ হ'ল ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই। এই সাফল্যের পিছনে রাশিয়া ও আমেরিকার বিজ্ঞানীদের অবদান অসামান্য। রাশিয়াই সর্বপ্রথম মহাকাশে স্পুটনিক বা কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করে জগদ্বাসীকে বিস্ময়ে হতবাক্ করে দেয়। পৃথিবীর মহাকর্ষ অতিক্রম করে সে উপগ্রহ সাফল্যের সঙ্গে পৃথিবীকে আবর্তন করে। অবশ্য মহাকাশ গবেষণায় আমেরিকাও পশ্চাৎপদ থাকে নি। তবে প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় রাশিয়ারই জয় হয়েছিল। মহাকাশ অভিযানে প্রথম প্রাণীকে প্রেরণ রাশিয়ার অত্যাশ্চর্য কীর্তিই বলা যায়। অবশ্য সে অভিযানে প্রাণীটি হ'ল 'লাইকা' নামে একটি সারমেয়। মহাকাশে উঠে উপগ্রহের মত জীবন্ত মানুষের প্রথম ভূ-প্রদক্ষিণও রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের অবিস্মরণীয় কীর্তি। এই অভিযানের নায়ক ছিলেন ইউরি গ্যাগারিন।

কিন্তু মহাকাশ জয়ে রাশিয়ার ভূমিকা প্রধান হলেও, প্রথম সার্থক চন্দ্রভিযানের গৌরব যে আমেরিকার তাতে আর সন্দেহ নেই। এই

চন্দ্রাভিযান করলেন আমেরিকার তিনজন মৃত্যুঞ্জয়ী বীর—নীল আর্মস্ট্রং, এড্যুইন অলড্রিন এবং মাইকেল কলিন্স। তাঁরা যে মহাকাশ-যানে চেপে অভিযান চালিয়েছিলেন তার নাম অ্যাপলো-১১। ১৯৬৯ সালের ১৬ই জুলাই আমেরিকার কেপ কেনেডি মহাকাশ কেন্দ্র থেকে তাঁরা যাত্রা শুরু করেন।

অ্যাপলো-১১-কে স্যাটার্ণ রকেট পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে চন্দ্রের কক্ষপথে পৌঁছে দিল তিন পর্যায়ে। অ্যাপলো-১১ চন্দ্রের কক্ষপথে পৌঁছে দু'বার চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এরই মধ্যে মহাকাশ-চারী অলড্রিন ও আর্মস্ট্রং চন্দ্রভেলায় চড়ে বসলেন। এই চন্দ্রভেলার নাম 'ঈগল'। এই চন্দ্রভেলা মূল মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে এসে আস্তে আস্তে চাঁদের মাটি স্পর্শ করল। কলিন্স মূল মহাকাশযানে থেকে চন্দ্রভেলার গতিবিধি, চন্দ্রভেলার আরোহীদের কার্যকলাপ ইত্যাদি তদারকি করে তার খবরাখবর পাঠাতে লাগলেন পৃথিবীর বুকে মহাকাশ কেন্দ্রে।

অবশেষে আর্মস্ট্রং সর্বপ্রথম চন্দ্রভেলার মই বেয়ে চাঁদের মাটিতে প্রথম পদার্পণ করলেন। মাটি স্পর্শ করে তিনি চীৎকার করে বলে উঠলেন আনন্দে অধীর হয়ে—কি সুন্দর, কি সুন্দর! তার কিছুক্ষণ পরে অলড্রিন নেমে এলেন চাঁদের বুকে। সেখানে তাঁরা উত্তোলন করলেন আমেরিকার জাতীয় পতাকা, বসালেন ভূকম্প নির্ণায়ক যন্ত্র। আর রাখলেন রাষ্ট্রসংঘের পতাকা। তারপর তাঁরা সংগ্রহ করলেন চাঁদের ধুলো নুড়ি আর পাথর। আসার আগে তাঁরা একটি ফলক রেখে এলেন চাঁদের মাটিতে: তাতে লেখা রইল—

"চাঁদের এই স্থানে মর্ত্যমানব ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে প্রথম পদক্ষেপ করে।

বিশ্বমানবের শান্তিবার্তা লইয়া আমরা আসিয়াছিলাম।"

এর পর প্রয়োজনীয় কাজ সেরে প্রায় আড়াই ঘণ্টা চাঁদের বুকে থেকে মহাকাশযাত্রীদ্বয় উঠে এলেন চন্দ্রভেলায়। চন্দ্রভেলার সুইচ টিপে তাকে চালনা করে মহাকাশচারীদ্বয় পুনরায় এলেন মূল মহাকাশযানের কাছে। তারপর চন্দ্রভেলা ও মহাকাশযানে সংযোগ ঘটিয়ে তাঁরা চলে এলেন মূল মহাকাশযানে, যেখানে কলিন্স অধীর আগ্রহে অতি যত্ন সহকারে সেই যান নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। এরপর মহাকাশচারীরা ঐ চন্দ্রলোক পরিত্যাগ করে পৃথিবী অভিমুখে মহাকাশযান চালিয়ে দিলেন। বেগে ঐ মহাকাশযান পৃথিবীমুখো রওনা হল। পথে কোন বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন তাঁরা হন নি। অবশেষে তাঁরা এই দুস্তর পথ পুনরায় পাড়ি দিয়ে ১৯৬৯ সালের ২৪শে জুলাই নির্বিঘ্নে নেমে এলেন প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে। সেখান থেকে জাহাজে করে এদের নিয়ে আসা হল আমেরিকার কূলে। এ হল চন্দ্র জয়—এই হল মানুষের জয়।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। কোন্ প্রেরণা মানুষকে নিত্য নব আবিষ্কারে প্রেরণা যুগিয়েছে ?

২। মহাকাশ জয়ে কারা প্রতিযোগিতায় প্রথম থেকেও চন্দ্রাভিযানে পিছিয়ে যায় ? কারা সর্বপ্রথম চন্দ্রাভিযানের সার্থকতা লাভ করে ? সে চন্দ্রাভিযানে কোন্ কোন্ বীর অংশ গ্রহণ করেছিলেন ?

৩। আমেরিকার সার্থক চন্দ্রাভিযানের বর্ণনা দাও।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

৪। "অজানাকে জানা……আদিম প্রবৃত্তি।"—আলোচ্য অংশটি কোন্ প্রবন্ধের অন্তর্গত ? মানুষের এই আদিম প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে মানুষ কি করেছে তার বর্ণনা দাও।

৫। "এই হল চন্দ্রজয়—এ হল মানুষের জয়!"—এই অংশটি কার লেখা

কোন প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে? কোন প্রসঙ্গে লেখক একথা বলেছেন? 'চন্দ্রজয়' ও 'মানুষের জয়' বলতে কি বুঝলে লেখ?

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৬। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব কত? চাঁদে বায়ু নেই, আর কী কী নেই?

৭। চাঁদে বায়ু না থাকায় ওজন ও চলার ক্ষেত্রে পৃথিবী থেকে কি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়?

৮। মহাকাশ চারীরা চাঁদ থেকে কোন কোন জিনিস নিয়ে আসেন? তাঁরা চাঁদে কি কি রেখে আসেন?

৯। ঈগল কি? মহাকাশচারীরা এটিকে কি কাজে লাগান?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ

১০। নিম্নরেখ বাক্যগুলির পদসমূহের বিপরীতার্থক শব্দযোগে এক একটি বাক্য গঠন কর:

(ক) মানুষের এই জয়যাত্রা সম্মুখের দিকে অগ্রসর।

(খ) আমেরিকার বিজ্ঞানীদের অবদান অসামান্য।

(গ) প্রথম সার্থক চন্দ্রাভিযানের গৌরব হল আমেরিকা।

(ঘ) কলিন্স অধীর আগ্রহে অতি যত্ন সহকারে সেই যান নিয়ে অপেক্ষা করেছিলেন।

১১। সাধু ভাষায় রূপান্তরিত কর:

(ক) নিত্য নব আবিষ্কার করছে।

(খ) মই বেয়ে প্রথম চাঁদের মাটিতে পা রাখেন।

(গ) মহাকাশ যাত্রীদ্বয় উঠে এলেন চন্দ্রভেলায়।

(ঘ) চাঁদকে পুরেছে আজ হাতের মুঠোয়।

১২। বায়ু, জল চাঁদ—এই তিনটি শব্দের প্রত্যেকটির কমপক্ষে তিনটি করে প্রতিশব্দ লেখ।

———

সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় সর্বজনবিদিত। বিশেষ করে ছোটদের সাহিত্যে তিনি অবিসংবাদিতভাবে খ্যাতিমান। নানাবিধ রচনায় পারঙ্গম শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় ছোটদের জন্য যেমন বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন, তেমনি পরিণতদের জন্যও তাঁর রচনা স্বল্প নয়। সম্পাদনা কার্যেও তাঁর বিশেষ খ্যাতি আছে। ইতঃপূর্বে ছোটদের ও বড়দের কয়েকখানি পত্রিকা ও সংকলন গ্রন্থ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি যেমন সম্পাদনা করেছেন, তেমনি দীর্ঘকাল ধরে 'বিষ্ণুশর্মা' ছদ্মনামে 'দৈনিক বসুমতী'র 'ছোটদের পাতা'টি তাঁরই পরিচালনায় প্রকাশিত হয়ে আসছে। শিশুদের প্রথম সাপ্তাহিক 'রবিবার'-এর তিনি অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। এই সকল নানা গুণাবলীর জন্য তাঁকে মৌচাক পুরস্কার, তথা সুধীরচন্দ্র সরকার পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

এতদ্ব্যতীত ছোটদের ও বড়দের বিবিধ গ্রন্থ সমূহের অনুবাদক হিসাবেও তিনি এমন কতকগুলি উল্লেখযোগ্য কার্য করেছেন, যা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে প্রভূত সাহায্য করেছে। ছোটদের জন্য ডিকেন্সের ওল্ড কিউরিয়োসিটি শপ্, ভিক্টর হুগোর টয়লার্স অফ্ দি সী, নানা দেশের নানা গল্প, বিদেশের বিচিত্র গল্প, অ্যাড্ভেঞ্চারস্ অফ্ মার্কোপোলো, ডেভিলস্ আইল্যাণ্ড, অ্যাড্ভেঞ্চার অফ ভেরি প্রভৃতি গ্রন্থগুলি যেমন তাঁর লেখনী-স্পর্শে অনূদিত হয়েছে, তেমনি বড়দের জন্য আলফঁস দোদের সাফো, হুমায়ুন কবিরের শরৎচন্দ্র (বাংলায় 'শরৎ-সাহিত্যের মূলতত্ত্ব' নামে), এবং অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ প্রভৃতি থেকেও তাঁর অনূদিত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এম.এ.-র অতিরিক্ত পাঠ্য হিসাবে তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ 'পুরাতন প্রসঙ্গ' পঠিত হয়।